ইয়া-সীন

৩৬

নামকরণ

যে দু'টি হরফ দিয়ে সূরার সূচনা করা হয়েছে তাকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী দেখে অনুভব করা যায়, এ সূরার নাযিল হবার সময়টি হবে নবী করীমের (সা) নবুওয়াত লাভ করার পর মক্কায় অবস্থানের মধ্যবর্তী যুগের শেষের দিনগুলো। অথবা এটি হবে তাঁর মক্কায় অবস্থানের একেবারে শেষ দিনগুলোর একটি সূরা।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের ওপর ঈমান না আনা এবং জুলুম ও বিদ্রূপের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করার পরিণামের ভয় দেখানোই এ আলোচনার লক্ষ। এর মধ্যে ভয় দেখানোর দিকটি প্রবল ও সুস্পষ্ট। কিন্তু বার বার ভয় দেখানোর সাথে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু বুঝাবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

তিনটি বিষয়ের ওপর যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে ঃ

০ তাওহীদের ওপর বিশ্ব–জাহানের নিদর্শনাবলী ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে।

০ আখেরাতের ওপর বিশ্ব–জাহানের নিদর্শনাবলী, সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও মানুষের নিজের অস্তিত্বের সাহায্যে।

০ মুহাম্মাদী নবুওয়াতের সত্যতার ওপর একথার ভিত্তিতে যে, তিনি নিজের রিসালাতের ক্ষেত্রে এ সমস্ত কষ্ট সহ্য করছিলেন নিস্বার্থভাবে এবং এ বিষয়ের ভিত্তিতে যে, তিনি লোকদেরকে যেসব কথার প্রতি আহবান জানাচ্ছিলেন সেগুলো পুরোপুরি যুক্তিসংগত ছিল এবং সেগুলো গ্রহণ করার মধ্যেই ছিল লোকদের নিজেদের কল্যাণ।

এ যুক্তি প্রদর্শনের শক্তির ওপর ভীতি প্রদর্শন এবং তিরস্কার ও সতর্ক করার বিষয়বস্তু অত্যন্ত জোরে শোরে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে হৃদয়ের তালা খুলে যায় এবং যাদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার সামান্যতম যোগ্যতাও আছে তারা যেন কুফরীর ওপর বহাল থাকতে না পারে।

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও তাবারানী প্রমুখগণ মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, يس قلب القران অর্থাৎ এ ইয়া-সীন সূরাটি কুরআনের হৃদয়। এটি ঠিক তেমনই একটি উপমা যেমন সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন বলা হয়েছে। ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে কুরআন মজীদের সমস্ত শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার এসে গেছে। অন্যদিকে ইয়াসীনকে কুরআনের স্পন্দিত হৃদয় বলা হয়েছে এ জন্য যে, কুরআনের দাওয়াতকে সে অত্যন্ত জোরেশোরে পেশ করে, যার ফলে জড়তা কেটে যায় এবং প্রাণপ্রবাহ গতিশীল হয়।

এই হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকেই হযরত ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, اقرءوا سورة يس على موتاكم "তোমাদের মৃতদের ওপর সূরা ইয়া–সীন পাঠ করো।" এর পেছনে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এর মাধ্যমে মরার সময় মুসলমানের অন্তরে কেবলমাত্র ইসলামী আকীদা বিশ্বাসই তাজা হয়ে যায় না বরং বিশেষভাবে তার সামনে আখেরাতের পূর্ণ চিত্রও এসে যায় এবং সে জানতে পারে দুনিয়ার জীবনের মনযিল অতিক্রম করে এখন সামনের দিকে কোন্ সব মনযিল পার হয়ে তাকে যেতে হবে। এ কল্যাণকারিতাকে পূর্ণতা দান করার জন্য আরবী জানে না এমন ব্যক্তিকে সূরা ইয়াসীন শুনাবার সাথে সাথে তার অনুবাদও শুনিয়ে দেয়া উচিত। এভাবে উপদেশ দান ও স্মরণ করিয়ে দেবার হক পুরোপুরি আদায় হয়ে যায়।

يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَاۤؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾

ইয়া-সীন।[১] বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম, তুমি নিসন্দেহে রসূলদের অন্তরভুক্ত,[২] সরল-সোজা পথ অবলম্বনকারী (এবং এ কুরআন) প্রবল পরাক্রমশালী ও করুণাময় সত্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত,[৩] যাতে তুমি সতর্ক করে দাও এমন এক জাতিকে যার বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণে তারা গাফলতিতে ডুবে আছে।[৪]

১. ইবনে আব্বাস, ইকরামা, দ্বাহ্হাক, হাসান বসরী ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বক্তব্য মতে এর অর্থ হচ্ছে, "হে মানুষ" অথবা "ওহে লোক" এবং কোন কোন মুফাসৃসির একে "ইয়া সাইয়েদ" এর সংক্ষিপ্ত উচ্চারণও গণ্য করেন। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে ধরা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে এ শব্দগুলো বলা হয়েছে।

২. এভাবে বক্তব্য শুরু করার কারণ নাউযুবিল্লাহ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দিহান ছিলেন এবং তাঁকে নিশ্চয়তা দান করার জন্য আল্লাহর একথা বলার প্রয়োজন হয়েছিল। বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, সে সময় কুরাইশ বংশীয় কাফেররা অত্যন্ত জোরেশোরে নবী করীমের (সা) নবুওয়াত অস্বীকার করছিল। তাই আল্লাহ কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই তাঁর ভাষণ শুরুই করেছেন এ বাক্য দিয়ে যে, "তুমি নিশ্চয়ই রসূলদের অন্তরভুক্ত।" অর্থাৎ যারা তোমার নবুওয়াত অস্বীকার করছে তারা বিরাট ভুল করছে। তারপর একথার ওপর কুরআনের কসম খাওয়া হয়েছে এবং কুরআনের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে "বিজ্ঞানময়" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমার নবী হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এ কুরআন যা পুরোপুরি জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এ জিনিসটি নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, যে ব্যক্তি এমন জ্ঞানপূর্ণ বাণী উপস্থাপন করছেন তিনি নিসন্দেহে আল্লাহর রসূল। কোন মানুষ এমন ধরনের বাণী রচনা করার ক্ষমতা রাখে না। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা

জানতো তাদের পক্ষে কোনক্রমেই এ বিভ্রান্তির শিকার হওয়া সম্ভব ছিল না যে, এ বাণী তিনি নিজে রচনা করে আনছেন অথবা অন্য কোন মানুষের কাছ থেকে শিখে এসে শুনাচ্ছেন। (এ বিষয়বস্তুর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, ২০, ২১, ২২, ৪৪, ৪৫; বনী ইসরাঈল, ১০৪, ১০৫ টীকা; সূরা নূরের ভূমিকা; সূরা আশ্ শূআরা, ১; আন্ নাম্ল, ৯২; আল কাসাস, ৬২, ৬৩, ৬৪, ১০২–১০৯; আল আনকাবুত, ৮৮–৯১ টীকা এবং আর রুমের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ১, ২, ৩ টীকা।)

৩. এখানে কুরআন নাযিলকারীর দু'টি গুণের কথা বলা হয়েছে। এক, তিনি প্রবল ও পরাক্রান্ত। দুই, তিনি করুণাময়। প্রথম গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সত্যটি সম্পর্কে সতর্ক করা যে, এ কুরআন কোন অক্ষম উপদেষ্টার উপদেশ নয় যে, একে উপেক্ষা করলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। বরং এটি এমন বিশ্ব–জাহানের মালিকের ফরমান যিনি সবার ওপর প্রবল পরাক্রান্ত, যাঁর ফায়সালাসমূহ প্রয়োগ করার পথে কোন শক্তি বাধা সৃষ্টি করতে পারে না এবং যার পাকড়াও থেকে রেহাই পাবার ক্ষমতা কারো নেই। আর দ্বিতীয় গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, তিনি নিছক দয়াপরবশ হয়ে তোমাদের হিদায়াত ও পথ দেখাবার জন্য নিজের রসূল পাঠিয়েছেন এবং এ মহান কিতাবটি নাযিল করেছেন, যাতে তোমরা গোমরাহী মুক্ত হয়ে এমন সরল সঠিক পথে চলতে পারো যে পথে চলে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভ করতে পারবে।

৪. এ আয়াতের দু'টি অনুবাদ হতে পারে। এর একটি অনুবাদ ওপরে করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি এও হতে পারে যে, "একটি জাতির লোকদেরকে তুমি সে জিনিসের ভয় দেখাও যার ভয় তাদের বাপ–দাদাদেরকেও দেখানো হয়েছিল, কারণ তারা গাফলতিতে ডুবে আছে।" প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে বাপ–দাদা বলতে নিকট অতীতে অতিক্রান্ত বাপ–দাদাদের কথা বুঝানো হবে। কারণ দূর অতীতে আরব ভূখন্ডে বহু নবী–রসূল এসেছিলেন। আর দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে এর অর্থ দাঁড়াবে প্রাচীনকালে এ জাতির পূর্বপুরুষদের কাছে নবীদের মাধ্যমে যে পয়গাম এসেছিল এখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করো। কারণ এরা তা ভুলে গেছে। এদিক দিয়ে দু'টি অনুবাদের মধ্যে আসলে কোন বৈপরীত্য নেই এবং অর্থের দিক দিয়ে উভয় অনুবাদ সঠিক ও অর্থবহ।

এ জায়গায় সন্দেহ জাগে যে, এ জাতির পূর্ববর্তী লোকেরা এমন একটি যুগ অতিক্রম করেছিল যখন তাদের কাছে কোন নবী আসেনি, এ সময়ে নিজেদের গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরা কেমন করে দায়ী হতে পারে? এর জবাব হচ্ছে, আল্লাহ যখনই দুনিয়ায় কোন নবী পাঠান তখনই তাঁর শিক্ষা ও হিদায়াতের প্রভাব দূর–দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং বংশ পরম্পরায় এ প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ প্রভাব যতদিন টিকে থাকে এবং নবীর অনুসারীদের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত এমনসব লোকের আবির্ভাব ঘটতে থাকে যারা হিদায়াতের প্রদীপ উজ্জ্বল করে যেতে থাকেন ততদিন পর্যন্তকার সময়কে হিদায়াতবিহীন গণ্য করা যেতে পারে না। আর যখন এ নবীর শিক্ষার প্রভাব একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথবা তা পুরোপুরি বিকৃত হয়ে যায় তখন সেখানে নতুন নবীর আবির্ভাব অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে আরবে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, শোআইব, মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের শিক্ষার প্রভাব চতুরদিক ছড়িয়েছিল। আর মাঝে মাঝে এ জাতির মধ্যে এমনসব লোকের আবির্ভাব ঘটতো অথবা

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧ اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ
اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝٨ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ
سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٩ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ
ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ
الذِّكْرَ وَخَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ۝١١
اِنَّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۚ
وَكُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِىْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝١٢

তাদের অধিকাংশই শাস্তি লাভের ফায়সালার হকদার হয়ে গেছে, এ জন্যই তারা ঈমান আনে না।[৫] *আমি তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যাতে তাদের চিবুক পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে, তাই তারা মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।*[৬] *আমি তাদের সামনে একটি দেয়াল এবং পেছনে একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। আমি তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না।*[৭] *তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা না করো তা তাদের জন্য সমান, তারা মানবে না।*[৮] *তুমি তো তাকেই সতর্ক করতে পারো যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে, তাকে মাগফেরাত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদানের সুসংবাদ দাও।*

আমি অবশ্যই একদিন মৃতদেরকে জীবিত করবো, যা কিছু কাজ তারা করেছে তা সবই আমি লিখে চলছি এবং যা কিছু চিহ্ন তারা পেছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমি স্থায়ী করে রাখছি।[৯] *প্রত্যেকটি জিনিস আমি একটি খোলা কিতাবে লিখে রাখছি।*

বাইর থেকে আগমন হতে থাকতো যারা এ প্রভাবগুলোকে তরতাজা করে তুলতেন। যখন এ প্রভাবগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং আসল শিক্ষাও বিকৃত হয়ে যায় তখন মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান এবং এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যার ফলে তাঁর হিদায়াতের প্রভাব নিশ্চিহ্ন হতে পারবে না। এবং তা বিকৃত হতেও পারবে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা সাবা, ৫ টীকা)

৫. যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় জিদ ও গোয়ার্তুমির পথ অবলম্বন করেছিল এবং তাঁর কথা কোনভাবেই মানবে না বলে সিদ্ধান্ত

নিয়েছিল এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তারা শাস্তিলাভের ফায়সালার হকদার হয়ে গেছে, তাই তারা ঈমান আনছে না।" এর অর্থ হচ্ছে, যারা উপদেশে কান দেয় না এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের মাধ্যমে প্রমাণ পুরোপুরি উপস্থাপিত হবার পরও সত্য অস্বীকার ও সত্যের সাথে শত্রুতার নীতি অবলম্বন করে চলতেই থাকে তাদের ওপর তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের দুর্ভোগ চাপিয়ে দেয়া হয় এবং তারপর তাদের ঈমানলাভের সৌভাগ্য হয় না। এ বিষয়বস্তুকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে এ বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, "তুমি তো এমন ব্যক্তিকেই সতর্ক করতে পারো যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে।"

৬. এ আয়াতে বেড়ি মানে হচ্ছে তাদের নিজেদের হঠকারিতা। তাদের জন্য সত্য গ্রহণ করার পথে এটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। "চিবুক পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে" এবং "মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে"–এর অর্থ হচ্ছে, অহংকার বশত ঘাড় তেড়া করে দাঁড়িয়ে থাকা। আল্লাহ বলছেন, তাদের জিদ ও হঠকারিতাকে আমি তাদের ঘাড়ের বেড়িতে পরিণত করে দিয়েছি এবং যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় তারা লিপ্ত রয়েছে তার ফলে তাদের ঘাড় এমনভাবে বাঁকা হয়ে গেছে যে, কোন উজ্জ্বলতর সত্য তাদের সামনে এসে গেলেও তারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না।

৭. সামনে একটি দেয়াল ও পেছনে একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেবার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ হঠকারিতা ও অহংকারের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে তারা পূর্বের ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং ভবিষ্যত পরিণামের কথাও চিন্তা করে না। তাদের অন্ধ স্বার্থপ্রীতি তাদেরকে এমনভাবে চারদিক থেকে ঢেকে নিয়েছে এবং তাদের বিভ্রান্তি এমনভাবে তাদের চোখের ওপর আচ্ছাদন টেনে দিয়েছে যার ফলে প্রত্যেক সুস্থবোধ সম্পন্ন ও অন্ধ স্বার্থপ্রীতিহীন মানুষ যে উন্মুক্ত সত্য দেখতে পায় তা তারা দেখতে পায় না।

৮. এর অর্থ এ নয় যে, এ অবস্থায় সত্যদীনের কথা প্রচার করা অর্থহীন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমার সাধারণ প্রচার সব ধরনের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের কথা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কিছু লোকের কথা সামনের দিকের আয়াতে আসছে। প্রথম ধরনের লোকদের মুখোমুখি হয়ে যখন দেখবে তারা অস্বীকার, অহংকার, বিদ্বেষ ও বিরোধিতার ওপর স্থির হয়ে আছে তখন তাদের পেছনে লেগে থাকার দরকার নেই। কিন্তু তাদের এ আচরণে হতাশ হয়েও মনোবল হারিয়ে নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ো না। কারণ, তুমি জানো না, মানুষের এ ভীড়ের মধ্যে আল্লাহর এমন বান্দা কোথায় আছে যে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে সরল–সঠিক পথে চলে আসবে। তোমার সত্য প্রচারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ দ্বিতীয় ধরনের লোকদের সন্ধান করা এবং তাদেরকে ছাঁটাই বাছাই করে বের করে আনা। একদিকে হঠকারীদেরকে ত্যাগ করে যেতে হবে এবং অন্যদিকে এ মূল্যবান সম্পদ হস্তগত করতে হবে।

৯. এ থেকে জানা যায়, মানুষের আমলনামা তিন ধরনের বিষয় সম্বলিত হবে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু ভালো–মন্দ কাজ করে তা আল্লাহর দফতরে লিখে নেয়া হয়। দুই, নিজের চারপাশের বস্তুসমূহের এবং নিজের শরীরের অংগ–প্রত্যংগের ওপর মানুষ যে

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ۝ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ۝ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ۝ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

২ রুকূ'

তাদেরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই জনপদের লোকদের কাহিনী শোনাও যখন সেখানে রসূলগণ এসেছিল।[১০] আমি তাদের কাছে দু'জন রসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তারা দু'জনকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল; তখন আমি তৃতীয়জনকে সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলাম এবং তারা সবাই বলেছিল, "তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে আমাদের পাঠানো হয়েছে।"

জনপদবাসীরা বললো, "তোমরা আমাদের মতো কয়েকজন মানুষ ছাড়া আর কেউ নও[১১] এবং দয়াময় আল্লাহ মোটেই কোন জিনিস নাযিল করেননি,[১২] তোমরা স্রেফ মিথ্যা বলছো।"

রসূলরা বললো, আমাদের রব জানেন আমাদের অবশ্যই তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আমাদের ওপর আর কোন দায়িত্ব নেই।[১৩]

প্রভাব (Impressions) রাখে তা সবও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং এ সমস্ত চিহ্ন এক সময় এমনভাবে সামনে ভেসে উঠবে যে, তার নিজের আওয়াজ শোনা যাবে, তার নিজের চিন্তা, নিয়ত ও ইচ্ছা-সংকল্পসমূহের সমস্ত কথা তার মানসপটে লিখিত আকারে দৃষ্টিগোচর হবে এবং এক একটি ভাল ও মন্দ কাজ এবং তার সমস্ত নড়াচড়া ও আচরণের ছবি সামনে এসে যাবে। তিন, মৃত্যুর পর নিজের ভবিষ্যত প্রজন্মের ওপর এবং নিজের সমাজ ও সমগ্র মানব জাতির ওপর নিজের ভালো ও মন্দ যেসব প্রভাব সে রেখে গেছে তা যতক্ষণ পর্যন্ত এবং যেখানে যেখানে সক্রিয় থাকবে তা সবই তার হিসেবে লেখা হতে থাকবে। নিজের সন্তানদেরকে সে ভালো মন্দ যা কিছু শিক্ষা দিয়েছে, নিজের সমাজ ক্ষেত্রে যা কিছু সুকৃতি বা দুষ্কৃতি ছাড়িয়েছে এবং মানবতার পক্ষে যে ফুল বা কাঁটা গাছ বপন করে গেছে এসবের পূর্ণ রেকর্ড ততক্ষণ পর্যন্ত তৈরি করা হতে থাকবে যতক্ষণ তার বপন করা এসব চারা দুনিয়ায় ভালো-মন্দ ফল উৎপাদন করে যেতে থাকবে।

১০. প্রাচীন কুরআন ব্যাখ্যাতাগণ সাধারণভাবে এ মত পোষণ করেছেন যে, এ জনপদটি হচ্ছে সিরিয়ার ইন্তাকিয়া শহর। আর এখানে যে রসূলদের কথা বলা হয়েছে তাঁদেরকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এ প্রসংগে যে বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তাতে একথাও বলা হয়েছে যে, সে সময় ইন্তাখিশ ছিল এ এলাকার বাদশাহ। কিন্তু এ পুরো কাহিনীটিই ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, ইকরামাহ, কাবুল আহবার, ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখ মনীষীগণ খৃষ্টানদের অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছেন এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইন্তাকিয়ায় সালুতী পরিবারের (Seleucid dynasty) ১৩ জন বাদশাহ এন্টিউকাস (Antiochus) নামে রাজ্য শাসন করেছিল। এ নামের শেষ শাসকের শাসন এবং সে সাথে গোটা পরিবারের শাসনকালও খৃষ্টপূর্ব ৬৫ সালে শেষ হয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগে ইন্তাকিয়াসহ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সমগ্র এলাকা রোমানদের শাসনাধীনে ছিল। তাছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেই তাঁর সহচরদেরকে ইসলাম প্রচারের জন্য ইন্তাকিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, খৃষ্টানদের কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বাইবেলের 'প্রেরিতদের কার্য' অধ্যায় থেকে জানা যায়, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার কয়েক বছর পর খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ প্রথমবার সেখানে পৌঁছেছিলেন। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যাদেরকে আল্লাহ রসূল বানিয়ে পাঠাননি এবং আল্লাহর রসূল যাদেরকে নিযুক্ত করেননি তারা যদি নিজস্ব উদ্যোগে ধর্মপ্রচারে বের হন, তাহলে কোন ধরনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহর রসূল গণ্য করা যেতে পারে না। তাছাড়া বাইবেলের বর্ণনা মতে ইন্তাকিয়া হচ্ছে প্রথম শহর যেখানকার অইসরাঈলিরা বিপুল সংখ্যায় ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং ঈসায়ী গীর্জা অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী হয়েছিল। অথচ কুরআন এখানে যে জনপদটির কথা বলছে সেটি এমন একটি জনপদ ছিল যার অধিবাসীরা রসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাবের শিকার হয়েছিল। ইন্তাকিয়া যে এমন ধরনের ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল যাকে রিসালাত অস্বীকার করার কারণে আগত আযাব গণ্য করা যেতে পারে, তার কোন প্রমাণ ইতিহাসে নেই।

এসব কারণে জনবসতি বলে এখানে ইন্তাকিয়া বুঝানো হয়েছে একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন বা হাদীসে এ জনবসতিটিকে চিহ্নিত করা হয়নি। এমনকি এ রসূলগণ কারা ছিলেন এবং কোন্ যুগে এদেরকে পাঠানো হয়েছিল, কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে একথাও জানা যায়নি। কুরআন মজীদ যে উদ্দেশ্যে এ কাহিনী এখানে বর্ণনা করছে তা বুঝার জন্য জনপদের ও রসূলগণের নাম জানার কোন প্রয়োজন নেই। কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশদেরকে একথা জানানো যে, তোমরা হঠকারিতা ও সত্য অস্বীকার করার সে একই নীতির ওপর চলছো যার ওপর চলেছিল এ জনপদের লোকেরা এবং তারা যে পরিণাম ভোগ করেছিল সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবার জন্য তোমরা প্রস্তুতি নিচ্ছো।

১১. অন্য কথায় তাদের বক্তব্য ছিল, তোমরা যেহেতু মানুষ, কাজেই তোমরা আল্লাহ প্রেরিত রসূল হতে পারো না। মক্কার কাফেররাও এ একই ধারণা করতো। তারা বলতো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রসূল নন, কারণ তিনি মানুষ ঃ

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ

"তারা বলে, এ কেমন রসূল, যে খাবার খায় এবং বাজারে চলাফেরা করে!"

(আল ফুরকান, ৭)

وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ -

"আর জালেমরা পরস্পর কানাঘুষা করে যে, এ ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কি। তারপর কি তোমরা চোখে দেখা এ যাদুর শিকার হয়ে যাবে?" (আল আম্বিয়া, ৩)

কুরআন মজীদ মক্কার কাফেরদের এ জাহেলী চিন্তার প্রতিবাদ করে বলে, এটা কোন নতুন জাহেলীয়াত নয়। আজ প্রথমবার এ লোকদের থেকে এর প্রকাশ হচ্ছে না। বরং অতি প্রাচীনকাল থেকে সকল মূর্খ ও অজ্ঞের দল এ বিভ্রান্তির শিকার ছিল যে, মানুষ রসূল হতে পারে না এবং রসূল মানুষ হতে পারে না। নূহের জাতির সরদাররা যখন হযরত নূহের রিসালাত অস্বীকার করেছিল তখন তারাও একথাই বলেছিল ঃ

مَا هٰذَآ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝

"এ ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে চায় তোমাদের ওপর তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। অথচ আল্লাহ চাইলে ফেরেশতা নাযিল করতেন। আমরা কখনো নিজেদের বাপ–দাদাদের মুখে একথা শুনিনি।"

(আল মু'মিননূন, ২৪)

আদ জাতি একথাই হযরত হুদ (আ) সম্পর্কে বলেছিল ঃ

مَا هٰذَآ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۝ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝

"এ ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তাই খায় যা তোমরা খাও এবং পান করে তাই যা তোমরা পান করো। এখন যদি তোমরা নিজেদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (আল মু'মিনূন, ৩৩–৩৪)

সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ) সম্পর্কেও এ একই কথা বলেছিল ঃ

اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ ۙ

"আমরা কি আমাদের মধ্য থেকে একজন মানুষের আনুগত্য করবো?" (ক্বামার, ২৪)

আর প্রায় সকল নবীর সাথেই এরূপ ব্যবহার করা হয়। কাফেররা বলে ঃ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا "তোমরা আমাদেরই মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও।" নবীগণ তাদের জবাবে বলেন ঃ

اِنْ نَّحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ

"অবশ্যই আমরা তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি চান অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।" (ইবরাহীম, ১১)

এরপর কুরআন মজীদ বলছে, এ জাহেলী চিন্তাধারা প্রতি যুগে লোকদের হিদায়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে এবং এরই কারণে বিভিন্ন জাতির জীবনে ধ্বংস নেমে এসেছে ঃ

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْۤا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا -

"তোমাদের কাছে কি এমন লোকদের খবর পৌছেনি? যারা ইতিপূর্বে কুফরী করেছিল তারপর নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করে নিয়েছে এবং সামনে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এসব কিছু হয়েছে এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসতে থেকেছে কিন্তু তারা বলেছে, "এখন কি মানুষ আমাদের পথ দেখাবে?" এ কারণে তারা কুফরী করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।"
(আত্ তাগাবুন, ৫-৬)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْۤا اِذْ جَاۤءَهُمُ الْهُدٰۤى اِلاَّۤ اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً -

"লোকদের কাছে যখন হিদায়াত এলো তখন এ অজুহাত ছাড়া আর কোন জিনিস তাদের ঈমান আনা থেকে বিরত রাখেনি যে, তারা বললো, "আল্লাহ মানুষকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?" (বনী ইসরাঈল, ৯৪)

তারপর কুরআন মজীদ সুস্পষ্টভাবে বলছে, আল্লাহ চিরকাল মানুষদেরকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই রসূল হতে পারে কোন ফেরেশতা বা মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোন সত্তা এ দায়িত্ব পালন করতে পারে না ঃ

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لاَّ يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

জনপদবাসীরা বলতে লাগলো, "আমরা তো তোমাদেরকে নিজেদের জন্য অমঙ্গলজনক মনে করি।[১৪] যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করবো এবং আমাদের হাতে তোমরা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।"

রসূলরা জবাব দিল, তোমাদের অমংগল তোমাদের নিজেদের সাথেই লেগে আছে।[১৫] তোমাদের উপদেশ দেয়া হয়েছে বলেই কি তোমরা একথা বলছো? আসল কথা হচ্ছে, তোমরা সীমালংঘনকারী লোক।"[১৬]

ইতিমধ্যে নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! রসূলদের কথা মেনে নাও। যারা তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চায় না এবং সঠিক পথের অনুসারী, তাদের কথা মেনে নাও।[১৭]

"তোমার পূর্বে আমি মানুষদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি অহি পাঠাতাম। যদি তোমরা না জানো তাহলে জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞেস করো। আর তারা আহার করবে না এবং চিরকাল জীবিত থাকবে, এমন শরীর দিয়ে তাদেরকে আমি সৃষ্টি করিনি।" (আল আম্বিয়া, ৭–৮)

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ –

"আমি তোমার পূর্বে যে রসূলই পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই আহার করতো এবং বাজারে চলাফেরা করতো।" (আল ফুরকান, ২০)

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○

"হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, যদি পৃথিবীতে ফেরেশাতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে থাকতো, তাহলে আমি তাদের প্রতি ফেশেতাদেরকেই রসূল বানিয়ে নাযিল করতাম।" (বনী ইসরাঈল, ৯৫)

১২. এটি আরো একটি মূর্খতা ও অজ্ঞতা। মক্কার কাফেররা এ মূর্খতা ও অজ্ঞতায় লিপ্ত ছিল। বর্তমানকালের তথাকথিত মুক্ত বুদ্ধির প্রবক্তারাও এতে লিপ্ত রয়েছে এবং প্রাচীনতম কাল থেকে প্রত্যেক যুগের অহী ও রিসালাত অস্বীকারকারীরা এতে লিপ্ত থেকেছে। চিরকাল এদের সবার চিন্তা ছিল, মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ আদতে কোন অহী নাযিল করেন না। তিনি কেবলমাত্র উর্ধজগতের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত। মানুষদের ব্যাপার মানুষদের নিজেদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

১৩. অর্থাৎ রব্বুল আলামীন্ তোমাদের কাছে যে পয়গাম পৌছিয়ে দেবার জন্য আমাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন কাজ আমাদের নেই। এরপর তা মেনে নেয়া বা না মেনে নেয়া তোমাদের ইচ্ছাধীন। তোমাদের ওপর বল প্রয়োগ করে মেনে নিতে বাধ্য করার দায়িত্ব আমাদের ওপর সোপর্দ করা হয়নি। আর তোমরা না মেনে নিলে তোমাদের কুফরীর কারণে আমরা পাকড়াও হবো না। বরং তোমাদের এ অপরাধের জন্য তোমাদের নিজেদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।

১৪. তাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, তোমরা আমাদের জন্য কুলক্ষুণে ও অশুভ। তোমরা এসে আমাদের উপাস্য দেবতাদের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছো তার ফলে দেবতারা আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এখন আমাদের ওপর যেসব বিপদ আসছে তা আসছে তোমাদেরই বদৌলতে। ঠিক এ একই কথাই আরবের কাফের ও মোনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বলতো ঃ

وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ

"যদি তারা কোন কষ্টের সম্মুখীন হতো, তাহলে বলতো, এটা হয়েছে তোমার কারণে।" (আন্ নিসা, ৭৮)

তাই কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ ধরনের জাহেলী কথাবার্তাই প্রাচীন যুগের লোকেরাও তাদের নবীদের সম্পর্কে বলতো। সামূদ জাতি তাদের নবীকে বলতো, اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ "আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে অমংগল জনক পেয়েছি।" (আন্ নম্‌লঃ ৪৭)

আর ফেরাউনের জাতিও এ একই মনোভাবের অধিকারী ছিল ঃ

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ –

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾ اِنِّىْٓ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ اِنِّىْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۗ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾

কেন আমি এমন সত্তার বন্দেগী করবো না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে?[১৮] তাঁকে বাদ দিয়ে কি আমি অন্য উপাস্য বানিয়ে নেবো? অথচ যদি দয়াময় আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে লাগবে না এবং তারা আমাকে ছাড়িয়ে নিতেও পারবে না।[১৯] যদি এমনটি করি[২০] তাহলে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে পড়বো। আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি,[২১] তোমরাও আমার কথা মেনে নাও।

(শেষ পর্যন্ত তারা তাকে হত্যা করে ফেললো এবং) সে ব্যক্তিকে বলে দেয়া হলো, "প্রবেশ করো জান্নাতে।"[২২] সে বললো, "হায়, যদি আমার সম্প্রদায় জানতো আমার রব কোন্ জিনিসের বদৌলতে আমার মাগফিরাত করেছেন এবং আমাকে মর্যাদাশালী লোকদের অন্তরভুক্ত করেছেন।"[২৩]

"যখন তারা ভালো অবস্থায় থাকে তখন বলে, এটা আমাদের সৌভাগ্যের ফল এবং তাদের ওপর কোন বিপদ এলে তাকে মূসা ও তার সাথীদের অলক্ষুণের ফল গণ্য করতো। (আল আরাফ, ১৩১)

১৫. অর্থাৎ কেউ কারোর জন্য অপয়া ও অলক্ষণ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির তাকদীরের লিখন তার নিজেরই গলায় ঝুলছে। কোন অকল্যাণ ও অঘটন ঘটলে তা হয় তার নিজের তাকদীরেরই ফল এবং শুভ ও কল্যাণকর কিছু ঘটলে তাও হয় তার তাকদীরের ফল।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ - بنى اسراءيل - ١٣

"প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ ও অকল্যাণের পরোয়ানা আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি।"

১৬. আসলে তোমরা কল্যাণ থেকে পালাতে চাও এবং হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী পছন্দ করো। তাই তোমরা যুক্তির মাধ্যমে হক ও বাতিলের ফায়সালা করার পরিবর্তে কুসংস্কার ও পৌরানিক ভাব কল্পনার মাধ্যমে বাহানাবাজি করছো।

১৭. এ একটি বাক্যের মাধ্যমেই সেই ব্যক্তি নবুওয়াতের সত্যতার সপক্ষে সমস্ত যুক্তি বর্ণনা করে দিয়েছেন। দু'টি কথার মাধ্যমেই একজন নবীর সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। এক, তাঁর কথা ও কাজ। দুই, তাঁর নিস্বার্থপর হওয়া। সে ব্যক্তির যুক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রথমত তাঁরা একটি ন্যায়সংগত কথা বলছেন এবং তাঁদের নিজেদের চরিত্র একেবারে নিষ্কলুষ। দ্বিতীয়ত তাঁরা নিজেদের কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন একথা কেউ চিহ্নিত করতে পারবে না। এরপর তাঁদের কথা কেন মেনে নেয়া হবে না তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সে ব্যক্তির এ যুক্তি উদ্ধৃত করে কুরআন মজীদ লোকদের সামনে একটি মানদন্ড তুলে ধরেছে যে, নবীর নবুওয়াত যাচাই করতে হলে এরি নিরিখে যাচাই করো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, তিনি সঠিক পথে রয়েছেন এবং তাছাড়া তাঁর প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের পেছনে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের লেশ মাত্রও নেই। এরপর কোন বিবেকবান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তাঁদের কথা প্রত্যাখ্যান করবে কিসের ভিত্তিতে?

১৮. এ বাক্যটি দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটিতে রয়েছে উন্নত যুক্তিবাদিতা এবং দ্বিতীয় অংশে সত্য প্রচারের সর্বোত্তম কৌশলের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। প্রথম অংশে তিনি বলছেন, স্রষ্টার বন্দেগী করা বুদ্ধি ও প্রকৃতির দাবীর নামান্তর মাত্র। অযৌক্তিক কথা যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে যারা মানুষ সৃষ্টি করেনি মানুষ তাদের বন্দেগী করবে এটাই অযৌক্তিক। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ তাঁর বন্দেগী করবে, এটা অযৌক্তিক নয়। দ্বিতীয় অংশে তিনি নিজের জাতির লোকদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করছেন যে, তোমাদের একদিন মরতে তো হবেই এবং যে আল্লাহর বন্দেগী করতে আজ তোমাদের আপত্তি তখন তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা কোন্ কল্যাণের আশা পোষণ করতে পারো।

১৯. অর্থাৎ তারা আল্লাহর এত প্রিয়ও নয় যে, আমি সুস্পষ্ট অপরাধ করবো এবং তিনি নিছক তাদের সুপারিশে আমাকে মাফ করে দেবেন। আবার তাদের এত শক্তিও নেই যে, আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিতে চান এবং তারা নিছক নিজেদের শক্তির জোরে আমাকে তাঁর কবল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারেন।

২০. অর্থাৎ এসব জেনে বুঝে যদি আমি তাদেরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করি।

২১. এ বাক্যের মধ্যে আবার সত্য প্রচারের একটি সূক্ষ্ম কৌশলের অবতারণা করা হয়েছে। একথা বলে সে ব্যক্তি তাদের অনুভূতিকে এভাবে সজাগ করেন যে, আমি যে রবের প্রতি ঈমান এনেছি তিনি কেবল আমারই রব নন বরং তোমাদেরও রব। তাঁর প্রতি ঈমান এনে আমি ভুল করিনি বরং তাঁর প্রতি ঈমান না এনে তোমরাই ভুল করছো।

২২. অর্থাৎ শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করার সাথে সাথেই তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হলো। যখনই মৃত্যুর দরোজা পার হয়ে তিনি অন্য জগতে পৌঁছে গেলেন, ফেরেশতারা সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং তারা তখনই তাঁকে এ মর্মে সুসংবাদ দিয়ে দিলেন যে, সুসজ্জিত বেহেশ্‌ত তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। এ বাক্যটির ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কাতাদাহ বলেন, "আল্লাহ তখনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, তিনি সেখানে জীবিত রয়েছেন

وَمَآ اَنۡزَلۡنَا عَلٰى قَوۡمِهٖ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ مِنۡ جُنۡدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنۡزِلِيۡنَ ﴿۲۸﴾ اِنۡ كَانَتۡ اِلَّا صَيۡحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمۡ خٰمِدُوۡنَ ﴿۲۹﴾ يٰحَسۡرَةً عَلَى الۡعِبَادِ ۚ مَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿۳۰﴾ اَلَمۡ يَرَوۡا كَمۡ اَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُمۡ مِّنَ الۡقُرُوۡنِ اَنَّهُمۡ اِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُوۡنَ ﴿۳۱﴾ وَاِنۡ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيۡعٌ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُوۡنَ ﴿۳۲﴾

এরপর তার সম্প্রদায়ের ওপর আমি আকাশ থেকে কোন সেনাদল পাঠাইনি, সেনাদল পাঠাবার কোন দরকারও আমার ছিল না। ব্যস, একটি বিস্ফোরণের শব্দ হলো এবং সহসা তারা সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলো।[২৪] বান্দাদের অবস্থার প্রতি আফসোস, যে রসূলই তাদের কাছে এসেছে তাকেই তারা বিদ্রূপ করতে থেকেছে। তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে কত মানব সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি এবং তারপর তারা আর কখনো তাদের কাছে ফিরে আসবে না?[২৫] তাদের সবাইকে একদিন আমার সামনে হাজির করা হবে।

এবং আহারলাভ করছেন। অন্যদিকে মুজাহিদ বলেন, "ফেরেশ্‌তারা একথা সুসংবাদ হিসেবে তাঁকে জানিয়ে দেন এবং এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামতের পরে যখন সকল মু'মিন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন তিনিও তাদের সাথে প্রবেশ করবেন।"

২৩. এটি সেই মু'মিন ব্যক্তির উন্নত নৈতিক মানসিকতার একটি শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। যারা এ মাত্র হত্যা কর্ম সংঘটিত করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে কোন ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল না। তিনি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য কোন বদদোয়া করছেন না। এর পরিবর্তে তিনি এখনো তাদের কল্যাণ কামনা করে চলছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর মনে যদি কোন আকাংখা জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে তা ছিল কেবলমাত্র এতটুকু যে, হায়, আমার জাতি যদি আমার এ শুভ পরিণাম জানতে পারতো এবং আমার জীবন থেকে না হলেও আমার মৃত্যু থেকেও যদি শিক্ষা নিয়ে সত্য–সঠিক পথ অবলম্বন করতো। এ ভদ্র–বিবেকবান মানুষটি নিজের হত্যাকারীদের জন্যও জাহান্নামের প্রত্যাশা করতেন না। বরং তিনি চাইতেন তারা ঈমান এনে জান্নাতের অধিকারী হোক। এরি প্রশংসা করে হাদীসে বলা হয়েছে نصح قومه حيا وميتا "এ ব্যক্তি জীবিত অবস্থায়ও নিজের জাতির কল্যাণকামী থেকেছে এবং মৃত্যুর পরও।"

এ ঘটনাটি বর্ণনা করে মহান আল্লাহ মক্কার কাফেরদেরকে পরোক্ষভাবে এ সত্যটির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا
مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾
سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

৩ রুকূ'

এদের[২৬] জন্য নিষ্প্রাণ ভূমি একটি নিদর্শন।[২৭] আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, যা এরা খায়। আমি তার মধ্যে খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্য থেকে ঝরণাধারা উৎসারিত করেছি, যাতে এরা তার ফল ভক্ষণ করে। এসব কিছু এদের নিজেদের হাতের সৃষ্ট নয়।[২৮] তারপরও কি এরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না?[২৯] পাক–পবিত্র সে সত্তা[৩০] যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তা ভূমিজাত উদ্ভিদের মধ্য থেকে হোক অথবা স্বয়ং এদের নিজেদের প্রজাতির (অর্থাৎ মানব জাতি) মধ্য থেকে হোক কিংবা এমন জিনিসের মধ্য থেকে হোক যাদেরকে এরা জানেও না।[৩১]

সাথী মু'মিনরাও তোমাদের ঠিক তেমনি যথার্থ কল্যাণকামী যেমন এ মর্দে মু'মিন তাঁর জাতির কল্যাণকামী ছিল। তোমাদের সকল প্রকার উৎপীড়ন–নিপীড়ন সত্ত্বেও এরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ স্পৃহা পোষণ করে না। তোমাদের সাথে এদের শত্রুতা নেই। বরং এদের শত্রুতা তোমাদের গোমরাহীর সাথে। তোমরা সত্যসঠিক পথে ফিরে আসবে, কেবল এ জন্যই এরা লড়াই করছে। এ ছাড়া এদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

যেসব আয়াত থেকে বরযখের (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত) জীবনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এ আয়াতটি তার অন্যতম। এ থেকে জানা যায় মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়–কাল চূড়ান্ত অস্তিত্ব বিলুপ্তির যুগ নয়। কোন কোন স্বল্পজ্ঞান–সম্পন্ন লোক এ রকম ধারণা পোষণ করে থাকে। বরং এ সময় দেহ ছাড়াই প্রাণ জীবিত থাকে, কথা বলে ও কথা শোনে, আবেগ–অনুভূতি পোষণ করে, আনন্দ ও দুঃখ অনুভব করে এবং দুনিয়াবাসীদের ব্যাপারেও তার আগ্রহ অব্যাহত থাকে। যদি এমনটি না হতো, তাহলে মৃত্যুর পর এ মর্দে মু'মিনকে কেমন করে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয় এবং তিনিই বা কেমন করে তার জাতির জন্য এ আকাংখা করেন যে, হায়, যদি তারা তাঁর এ শুভ পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারতো।

২৪. মূল শব্দটি হচ্ছে "নিভে গেল।" এ শব্দের মধ্যে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম ব্যাংগ। নিজেদের শক্তির জন্য তাদের অহংকার এবং সত্যদীনের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত ক্ষোভ ও আক্রোশ ছিল যেন একটি জলন্ত অগ্নিশিখা। তারা মনে করছিল, এটি ঐ তিনজন নবী ও তাঁদের অনুসারীদেরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। কিন্তু আল্লাহর আযাবের একটি আঘাতেই এ অগ্নিশিখা ঠান্ডা হয়ে গেলো।

২৫. অর্থাৎ এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে যে, কোথাও তাদের সামান্যতম চিহ্নও নেই। যে একবার পড়ে গেছে সে আর ওঠেনি। দুনিয়ায় আজ তাদের নাম নেবার মতো একজন লোকও বেঁচে নেই। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিই নয়, তাদের বংশধারাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

২৬. মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় অস্বীকার, মিথ্যা আরোপ ও সত্য বিরোধিতার যে কর্মনীতি অবলম্বন করে, পিছনের দু'রুকূ'তে তার নিন্দা করা হয়েছে। আর এখন ভাষণের মোড় ফিরে যাচ্ছে মূল বিবাদের দিকে, যা তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার দ্বন্দ্ব–সংঘাতের আসল কারণ ছিল। অর্থাৎ তাওহীদ ও আখেরাতের বিশ্বাস, যা নবী করীম (সা) পেশ করছিলেন এবং কাফেররা মেনে নিতে অস্বীকার করছিল। এ প্রসঙ্গে একের পর এক কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করে লোকদেরকে এ মর্মে চিন্তা–ভাবনা করার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে যে, তোমাদের চোখের সামনে বিশ্ব–জাহানের এই যে, নিদর্শনাবলী প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে, এগুলো কি এ সত্যটির প্রতি পরিষ্কার অংগুলি নির্দেশ করছে না, যা এ নবী তোমাদের সামনে পেশ করছেন?

২৭. অর্থাৎ তাওহীদই সত্য এবং শিরক পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

২৮. এ বাক্যটির দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে, "যাতে এরা খেতে পারে তার ফল এবং সে জিনিসগুলো, যা এদের নিজেদের হাত তৈরি করে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে এরা নিজেরা যেসব কৃত্রিম খাদ্য তৈরি করে যেমন রুটি, তরকারী, মুরব্বা, আচার, চাটনি এবং অন্যান্য অসংখ্য জিনিস।

২৯. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলোতে ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতাকে যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। মানুষ দিনরাত ভূমি থেকে উৎপাদিত শস্য–ফলমূল খাচ্ছে। তারা নিজেরা একে একটি মামুলি ব্যাপার মনে করে থাকে। কিন্তু গাফলতির পর্দা ছিন্ন করে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে তারা জানতে পারবে, এ ভূমির আস্তরণ ভেদ করে সবুজ শ্যামল ফসল ও বন–বনানীর সৃষ্টি এবং তার মধ্যে নদ–নদী ও স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হওয়া এমন কোন খেলা নয় যা নিজে নিজেই চলছে। বরং এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে একটি বিরাট জ্ঞান, শক্তি এবং প্রতিপালন ও পরিচালন ব্যবস্থা। পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে দেখা যাবে যেসব উপাদানের সাহায্যে এটি গঠিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আপনা–আপনি বিকাশ, বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি লাভ করার কোন ক্ষমতা নেই। এসব উপাদান এককভাবেও এবং সব রকমের মিশ্রণ ও সংগঠনের পরও থাকে একেবারেই অকেজো ও অনুপযোগী। এ কারণে এদের মধ্যে জীবনের নামমাত্রও নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ নিষ্প্রাণ যমীনের বুক চিরে উদ্ভিদ জীবনের উন্মেষ সম্ভব হলো কেমন করে? এ

সম্পর্কে অনুসন্ধান চালালে জানা যাবে, পূর্বাহ্নেই কয়েকটি বড় বড় কার্যকারণ সংগৃহীত না হলে এ জীবনধারা আদৌ অস্তিত্বলাভই করতে পারতো না।

প্রথমত, পৃথিবীর বিশেষ অংশসমূহে তার উপরিভাগের ভূপৃষ্ঠে এমন অনেক জৈবিক উপাদানের আস্তরণ বিছানো হয়েছে যা উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হবার উপযোগী হতে পারতো। এ আস্তরণকে নরম রাখা হয়েছে, যাতে উদ্ভিদের শিকড় তার মধ্যে বিস্তার লাভ করে নিজের খাদ্য আহরণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যমীনের ওপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে খাদ্য উপাদানসমূহ তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এমন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যার ফলে উদ্ভিদের শিকড়সমূহ তা চুষে নিতে সক্ষম হয়।

তৃতীয়ত, ওপরের শূন্যলোকে বায়ু সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বায়ু উর্ধলোকের বিপদ–আপদ থেকে যমীনের হেফাজত করে এবং বৃষ্টি পরিবহনের কাজ সম্পাদন করে। এ সংগে এর মধ্যে এমন সব গ্যাসের সমাবেশ ঘটে যা উদ্ভিদের জীবন এবং তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশলাভের জন্য প্রয়োজন।

চতুর্থত, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে উদ্ভিদ তাদের জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় হারে উষ্ণতা এবং অনুকূল পরিবেশ ও মওসূম লাভ করতে পারে।

এ চারটি বড় বড় কার্যকারণ (যেগুলো মূলগতভাবে অসংখ্য আনুষংগিক কার্যকারণের সমষ্টি) সৃষ্টি করে দেয়ার পর উদ্ভিদের অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভবপর হয়। তারপর এ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবার পর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের বীজ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যার ফলে যখনই তা উপযোগী জমি, পানি, বাতাস ও মওসূমের সংস্পর্শে আসে তখনই তার মধ্যে উদ্ভিদ সুলভ জীবনের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। এছাড়াও এ বীজের মধ্যে এমন ব্যবস্থাও করে দেয়া হয়েছে যার ফলে প্রত্যেক উদ্ভিদ প্রজাতির বীজ থেকে অনিবার্যভাবে একই প্রজাতির চারা তার যাবতীয় শ্রেণী স্বাতন্ত্র ও উত্তরাধিকার বৈশিষ্ট সহকারে জন্ম নেয়। এর ওপর বাড়তি যে সৃজন কুশলতার অবতারণা করা হয় তা হচ্ছে এই যে, দশ–বিশ বা পঞ্চাশ শ্রেণীর নয় বরং অসংখ্য শ্রেণীর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় এবং সেগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যার ফলে তারা অসংখ্য শ্রেণীর পশু ও মানবকূলের খাদ্য, ঔষুধ, পোশাক ও অন্যান্য অগণিত প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম হয়, উদ্ভিদের পরে পৃথিবীর বুকে এ প্রয়োজনগুলো অস্তিত্বলাভের অপেক্ষায় ছিল।

এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ব্যক্তিই চিন্তা করবে সে যদি হঠকারিতা ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতির শিকার না হয় তাহলে তার অন্তর সাক্ষ দেবে, এসব কিছু আপনা–আপনি হতে পারে না। এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে একটি জ্ঞানদীপ্ত পরিকল্পনা কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে মওসুমের সম্পর্ক উদ্ভিদের সাথে এবং উদ্ভিদের সম্পর্ক জীব জন্তু ও মানুষের প্রয়োজনের সাথে চরম স্পর্শকাতরতা ও সূক্ষতা বজায় রেখে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কোন বুদ্ধি–বিবেকবান মানুষ ধারণা করতে পারে না এ ধরনের সর্বব্যাপী সম্পর্ক নিছক ঘটনাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তারপর এ ব্যবস্থাপনা আবার একথাও প্রমাণ করে যে,

এটি বহু প্রভুর কৃতিত্ব হতে পারে না। এটি এমন একজন মাত্র ইলাহর ব্যবস্থাধীনে সম্পাদিত হচ্ছে এবং হতে পারে যিনি মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানব জাতি সবার স্রষ্টা ও রব। এদের প্রত্যেকের প্রভু যদি আলাদা আলাদা হতো তাহলে কেমন করে এমনি ধরনের একটি সর্বব্যাপী ও গভীর জ্ঞানময় সম্পর্ক রক্ষাকারী পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যাওয়ার এবং লাখো–লাখো কোটি–কোটি বছর পর্যন্ত এমন সুশৃংখলভাবে যথানিয়মে পরিচালিত হবার কথা কল্পনা করা যেতে পারে।

তাওহীদের সপক্ষে এ যুক্তি পেশ করার পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَفَلَا يَشْكُرُونَ অর্থাৎ এরা কি এমনই অকৃতজ্ঞ ও নিমকহারাম হয়ে গেছে যে, যে আল্লাহ এদের জীবনের জন্য এ সমস্ত সাজ–সরঞ্জাম সরবরাহ করে দিয়েছেন এরা তাঁর শোকরগুজারী করে না এবং তাঁর নিয়ামতগুলো উদরস্থ করে অন্যের শোকরগুজারী করে? তাঁর সামনে মাথা নত করে না এবং তাদের জন্য যে মিথ্যা উপাস্যরা একটি ঘাসও সৃষ্টি করেনি তাদের সামনে মাথা নত করে ষষ্ঠাংগ প্রণিপাত করে?

৩০. অর্থাৎ সব রকমের দোষ–ক্রটির আবিলতামুক্ত, সব রকমের দুর্বলতা ও ভ্রান্তির উর্ধে তাঁর কোন শরীক ও ভাগীদার আছে এ ধরনের চিন্তা–ভাবনার কোন অবকাশই নেই। মুশরিকদের আকীদা–বিশ্বাস খণ্ডন করে সাধারণভাবে কুরআন মজীদে এ শব্দগুলো এ জন্য ব্যবহার করা হয় যে, শিরকের প্রতিটি আকীদা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি কোন না কোন দোষ–ক্রটি, দুর্বলতা ও ভ্রান্তির অপবাদ। আল্লাহর জন্য শরীক নির্ধারণ করার অর্থই হচ্ছে এই যে, এ ধরনের কথা যে বলে সে আসলে মনে করে, আল্লাহ একা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরিচালনার যোগ্যতা রাখেন না অথবা তিনি নিজে তাঁর প্রভুত্বের কর্তৃত্ব পরিচালনায় কাউকে শরীক করতে বাধ্য কিংবা অন্য কতিপয় সত্তা আপনা আপনিই এত বেশী শক্তির অধিকারী হয়ে গেছে যে, তারা প্রভুত্বের ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করছে এবং আল্লাহ তাদের হস্তক্ষেপ বরদাশ্ত করছেন অথবা নাউযুবিল্লাহ তিনি মানব বংশজাত রাজা–বাদশাহদের মতো দুর্বলতার অধিকারী, যে কারণে মন্ত্রী, পারিষদবর্গ, মোসাহেব ও প্রিয় শাহজাদা ও শাহজাদীদের একটি বিরাট দলের দ্বারা তিনি ঘেরাও হয়ে আছেন এবং আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের বহু ক্ষমতা তাদের মধ্যে বন্টিত হয়ে গেছে। আল্লাহ সম্পর্কে এ জাহেলী ধ্যান–ধারণা যদি চিন্তা–চেতনার সাথে সম্পৃক্ত না থাকতো, তাহলে আদতে শিরকের চিন্তার জন্মই হতে পারতো না। তাই কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যেসব দোষ, অভাব ও দুর্বলতা সম্পৃক্ত করে, আল্লাহ তা থেকে মুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র।

৩১. এটি তাওহীদের সপক্ষে আরো একটি যুক্তি। এখানে আবার পূর্ব থেকে উপস্থিত সত্যগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটিকে নিয়ে একথা বলা হচ্ছে যে, দিনরাত তোমরা যেসব জিনিস স্বচক্ষে দেখে চলছো এবং কোনপ্রকার ভাবনা–চিন্তা না করেই এমনিই সামনের দিকে এগিয়ে চলে যেতে থাকো সেগুলোর মধ্যেই সত্যের সন্ধান দেবার মতো নিদর্শনাবলী রয়ে গেছে। নারী ও পুরুষের জুটি তো মানুষের নিজের জন্মের উৎস। জীব–জন্তুর বংশধারাও পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় পশুর মিলনের সাহায্যেই এগিয়ে চলছে। উদ্ভিদ সম্পর্কেও মানুষ জানে, তাদের মধ্যে বিপরীত লিংগের জুড়ি বাঁধার নীতি কার্যকর রয়েছে। এমনকি নিষ্প্রাণ জড় বস্তুর মধ্যেও দেখা যায় বিভিন্ন বস্তু যখন একটা অন্যটার সাথে যুথবদ্ধ হয় তখনই

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾

এদের জন্য রাত হচ্ছে আর একটি নিদর্শন। আমি তার উপর থেকে দিনকে সরিয়ে দেই তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়।[৩২] *আর সূর্য, সে তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে ধেয়ে চলছে।*[৩৩] *এটি প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার নিয়ন্ত্রিত হিসেব। আর চাঁদ, তার জন্য আমি মন্‌যিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, সেগুলো অতিক্রম করে সে শেষ পর্যন্ত আবার খেজুরের শুকনো ডালের মতো হয়ে যায়।*[৩৪] *না সূর্যের ক্ষমতা আছে চাঁদকে ধরে ফেলে*[৩৫] *এবং না রাত দিনের ওপর অগ্রবর্তী হতে পারে,*[৩৬] *সবাই এক একটি কক্ষপথে সন্তরণ করছে।*[৩৭]

তাদের থেকে নানা প্রকার যৌগিক পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে। স্বয়ং পদার্থের মৌলিক গঠন ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বৈদ্যুতিক শক্তির সংযোগেই সম্পন্ন হয়েছে। এ যুথিবদ্ধতা, যার মাধ্যমে এ সমগ্র বিশ্ব–জাহান অস্তিত্ব লাভ করেছে, প্রজ্ঞা ও সৃষ্টি কুশলতার এমন সব সূক্ষ্মতা ও জটিলতার অধিকারী এবং তার মধ্যে প্রতিটি জোড়ায় সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের মধ্যে এমনসব সম্পর্ক পাওয়া যায়, যার ফলে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী কোন ব্যক্তি এ জিনিসটিকে একটি আকস্মিক ঘটনাচক্র বলতে পারেন না। আবার একথা মেনেও নিতে পারেন না যে, বিভিন্ন ইলাহ এসব অসংখ্য জোট সৃষ্টি করে এদের মধ্যে এ ধরনের বুদ্ধিমত্তা সহকারে জুড়ি বেঁধে দিয়ে থাকবেন। পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পরের জুড়ি হওয়া এবং তাদের জুড়ি হবার ফলে নতুন জিনিসের সৃষ্টি হওয়া স্বয়ং স্রষ্টার একত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৩২. দিন–রাত্রির আসা–যাওয়াও পূর্ব থেকে উপস্থিত সত্যগুলোর অন্যতম। স্বাভাবিকভাবে দুনিয়ায় এগুলো নিয়মিত ঘটে চলছে বলে নিছক এ জন্য মানুষ এগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। অথচ যদি দিন কেমন করে আসে, রাত কেমন করে অতিবাহিত হয় এবং দিনের চলে যাওয়ার ও রাতের ফিরে আসার মধ্যে কি কি বিজ্ঞতা ও কৌশল সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে সে চিন্তা–ভাবনা করতো তাহলে নিজেই অনুভব করতো যে, এটি একজন শক্তিশালী ও জ্ঞানবান রবের অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ। পৃথিবীর সামনে থেকে সূর্যের সরে না যাওয়া পর্যন্ত কখনো দিনের বিদায় ও রাতের আগমন হতে পারে না। দিনের সরে যাওয়া এবং রাতের আগমনের মধ্যে যে চরম নিয়মানুবর্তিতা পাওয়া যায় তা সূর্য ও পৃথিবীকে একই অপরিবর্তনশীল বিধানের আওতায় আবদ্ধ না রেখে সম্ভবপর ছিল না। তারপর এ রাত ও দিনের আসা–যাওয়ার যে

গভীর সম্পর্ক পৃথিবীর সৃষ্ট জীবকুলের সাথে পাওয়া যায় তা পরিষ্কারভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, চরম বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সহকারে কোন সত্তা ইচ্ছাকৃতভাবেই এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পৃথিবীর বুকে মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব, বরং এখানে পানি, হাওয়া ও বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের অস্তিত্বও আসলে পৃথিবীকে সূর্য থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে অবস্থান করাবার এবং তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের একটি ধারাবাহিকতা সহকারে নির্ধারিত বিরতির পর সূর্যের সামনে আসার এবং তার সামনে থেকে সরে যেতে থাকার ফল। যদি পৃথিবীর দূরত্ব সূর্য থেকে খুব কম বা বেশী হতো অথবা তার এক অংশে সবসময় রাত ও অন্য অংশে সব সময় দিন থাকতো কিংবা দিন–রাত্রির পরিবর্তন অতি দ্রুত বা অতি শ্লথ গতিতে হতো অথবা নিয়ম বহির্ভূতভাবে হঠাৎ কখনো দিনের উদয় হতো আবার কখনো রাত ঢেকে ফেলতো, তাহলে এ পৃথিবীতে কোন জীবনের অস্তিত্ব লাভ সম্ভবপর হতো না। শুধু তাই নয় বরং এ অবস্থায় নিষ্প্রাণ পদার্থসমূহের আকার–আকৃতিও তাদের বর্তমান আকৃতি থেকে ভিন্নতর হতো। অন্তরের চোখ যদি বন্ধ করে না রাখা হয়, তাহলে মানুষ এ ব্যবস্থার মধ্যে এমন এক আল্লাহর কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করতে পারে যিনি এ পৃথিবীর বুকে এ বিশেষ ধরনের সৃষ্ট জীবকুলকে অস্তিত্ব দান করার সংকল্প করেন এবং তাদের যথাযথ প্রয়োজন অনুসারে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন। আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব যদি কোন ব্যক্তির দৃষ্টিতে বুদ্ধি বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে সে নিজেই চিন্তা করে বলুক, এ কলাকৌশলকে বহু ইলাহর সাথে সংশ্লিষ্ট করা অথবা কোন অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক আইনের আওতায় আপনা–আপনিই এসব কিছু হয়ে গেছে বলে মনে করা কতদূর বুদ্ধি বিরোধী হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে একেবারেই অযৌক্তিক এ শেষোক্ত ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারে, সে যখন বলে, বিশ্ব–জাহানে আইন–শৃংখলা, জ্ঞান–প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যমুখিনতার সন্ধান পাওয়া আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়, তখন আমাদের জন্য একথা মেনে নেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় যে, যথার্থই এ ব্যক্তি কোন মতবাদ বা বিশ্বাসকে স্বীকার করে নেবার জন্য কোন পর্যায়েরও যথেষ্ট বা অযথেষ্ট যৌক্তিক সাক্ষ–প্রমাণের প্রয়োজন অনুভব করে।

৩৩. অবস্থান বলতে এমন জায়গাও বুঝানো যেতে পারে যেখানে গিয়ে সূর্যকে সবশেষে থেমে যেতে ও অবস্থান গ্রহণ করতে হবে আবার এমন সময়ও হতে পারে যখন সে থেমে যাবে। এ আয়াতের সঠিক অর্থ মানুষ তখনই নির্ধারণ করতে পারে যখন বিশ্ব–জাহানের নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে সে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তা প্রত্যেক যুগে পরিবর্তনশীল ছিল এবং বর্তমানে বাহ্যত সে যা কিছু জানে যে কোন সময় তা পরিবর্তিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাচীন যুগের লোকেরা তাদের চাক্ষুষ দর্শনের ভিত্তিতে সূর্য সম্পর্কে এ নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করতো যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তারপর আরো গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পরে এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং সৌর জগতের গ্রহসমূহ তার চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু এ মতবাদও স্থায়ী প্রমাণিত হয়নি। পরবর্তীকালের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবলমাত্র সূর্যই নয় বরং সমস্ত তারকারাজি, যাদেরকে অনড় (Fixed Stars) মনে করা হতো, একদিকে ছুটে চলছে। তাদের চলার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১০ থেকে ১০০ মাইল বলে অনুমান করা হয়েছে। আর

আধুনিক আকাশ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণ সূর্য সম্পর্কে বলেন যে, সে তার সমগ্র সৌরজগত নিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ২০ কিলোমিটার (অর্থাৎ প্রায় ১২ মাইল) গতিতে এগিয়ে চলছে। (দেখুন ইন্সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, 'ষ্টার' ও 'সান' শব্দ)

৩৪. অর্থাৎ মাসের মধ্যে চাঁদের আবর্তন প্রতিদিন পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম দিন সে 'হেলাল' আকারে উদিত হয়। তারপর প্রতিদিন তার দেহ বড় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চতুর্দশীর রাতে সে পূর্ণ চন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। তারপর প্রতিদিন তার দেহ হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত আবার হেলালের আকারে ফিরে আসে। লাখো–লাখো বছর থেকে এ প্রক্রিয়া চলছে। এবং চাঁদের এ নির্ধারিত মন্‌যিলগুলো পরিভ্রমণের মধ্যে কখনো কোন ব্যতিক্রম দেখা দেয়নি। এ কারণে মানুষ হিসেব করে সবসময় বলতে পারে চাঁদ কোন্ দিন কোন্ মন্‌যিলে থাকবে। চাঁদের আবর্তন যদি কোন নিয়মের অধীন না হতো, তাহলে এ ধরনের হিসেব করা সম্ভব হতো না।

৩৫. এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। একটি হচ্ছে, চাঁদকে ধরে নিজের দিকে টেনে নেবার অথবা তার গতিপথে প্রবেশ করে তার সাথে সংঘাত বাধাবার ক্ষমতা সূর্যের নেই। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, চাঁদের উদয়ের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে সূর্য কখনো তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। রাতে চাঁদ আকাশে আলো ছড়াচ্ছে এ সময় হঠাৎ দিগন্তে সূর্যের উদয় সম্ভব নয়।

৩৬. অর্থাৎ দিনের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবার আগে কখনো রাত এসে যাওয়া এবং দিনের আলোর জন্য যে সময় নির্ধারিত রয়েছে তার মধ্যে অকস্মাত নিজের অন্ধকার নিয়ে তার উপস্থিত হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

৩৭. মূলে "ফালাক" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় "ফালাক" মানে গ্রহ–নক্ষত্রের কক্ষপথ (Orbit) এবং এর অর্থ আকাশের অর্থ থেকে ভিন্ন। "সবাই একটি কক্ষপথে সাঁতরাচ্ছে" এ উক্তি চারিটি সত্যের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করছে। এক, কেবলমাত্র সূর্য ও চন্দ্র নয় বরং সমস্ত তারকা ও গ্রহ এবং সমগ্র আকাশ জগত আবর্তন করছে। দুই, এদের প্রত্যেকের আকাশ অর্থাৎ প্রত্যেকের আবর্তন পথ বা কক্ষপথ আলাদা। তিন, আকাশসমূহ তারকারাজিকে নিয়ে আবর্তন করছে না বরং তারকারাজি আকাশসমূহে আবর্তন করছে। চার, আকাশসমূহে তারকাদের আবর্তন এমনভাবে হচ্ছে যেমন কোন তরল পদার্থে কোন জিনিস ভেসে চলে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা এ আয়াতগুলোর মূল উদ্দেশ্য নয় বরং মানুষকে একথা বুঝানোই এর উদ্দেশ্য যে, যদি সে চোখ মেলে তাকায় এবং নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে তাহলে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত যেদিকেই তাকাবে সেদিকেই তার সামনে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের অসংখ্য ও অগণিত যুক্তি–প্রমাণের সমাবেশ দেখতে পাবে। এ অবস্থায় সে কোথাও নাস্তিক্যবাদ ও শিরকের সপক্ষে একটি যুক্তি–প্রমাণও পাবে না। আমাদের এ পৃথিবী যে সৌরজগতের (Solar System) অন্তরভুক্ত তার বিশালত্বের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার কেন্দ্রীয় সূর্যটি পৃথিবীর তিন লক্ষ গুণ বড় এবং তার সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ নেপচুনের দূরত্ব সূর্য থেকে কমপক্ষে ২শ' ৭৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। বরং যদি প্লুটোকে দূরবর্তী গ্রহ ধরা হয় তাহলে সূর্য থেকে তার দূরত্ব ৪শ' ৬০ কোটি মাইলে গিয়ে

وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

এদের জন্য এটিও একটি নিদর্শন যে, আমি এদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায় চড়িয়ে দিয়েছি[৩৮] এবং তারপর এদের জন্য ঠিক তেমনি আরো নৌযান সৃষ্টি করেছি যেগুলোতে এরা আরোহণ করে।[৩৯] আমি চাইলে এদেরকে ডুবিয়ে দেই, এদের কোন ফরিয়াদ শ্রবণকারী থাকবে না এবং কোনভাবেই এদেরকে বাঁচানো যেতে পারে না। ব্যস, আমার রহমতই এদেরকে কূলে ভিড়িয়ে দেয় এবং একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জীবনের দ্বারা লাভবান হবার সুযোগ দিয়ে থাকে।[৪০]

পৌঁছে। এ বিশালত্ব সত্ত্বেও এ সৌরজগত একটি বিরাট বিশাল ছায়াপথের নিছক একটি ছোট অংশ মাত্র। আমাদের এ সৌরজগত যে ছায়াপথটির (Galaxy) অন্তরভুক্ত তার মধ্যে প্রায় ৩ হাজার মিলিয়ন (৩শ' কোটি) সূর্য রয়েছে এবং তার নিকটবর্তী সূর্যটি আমাদের পৃথিবী থেকে এত দূরে অবস্থান করছে যে, তার আলো এখানে পৌঁছুতে ৪ বছর সময় লাগে। তারপর এ ছায়াপথই সমগ্র বিশ্ব-জাহান নয়। বরং এতদিনকার পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমান করা হয়েছে যে, প্রায় ২০ লক্ষ নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে এটিও একটি এবং এদের নিকটতম নীহারিকা আমাদের থেকে এত বেশী দূরত্বে অবস্থিত যে, তার আলো আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছুতে ১০ লক্ষ বছর লাগে। আর আমাদের অত্যাধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সবচেয়ে দূরের যে নীহারিকা দৃষ্টিগোচর হয় তার আলো দুনিয়ায় পৌঁছতে ১০ কোটি বছর লাগে। এরপরও মানুষ সমগ্র বিশ্ব-জাহান দেখে নিয়েছে, একথা বলা যায় না। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের সামান্যতম অংশমাত্র এতদিন পর্যন্ত মানুষ পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছে। সামনের দিকে আরো অত্যাধুনিক পর্যবেক্ষণ উপকরণ উদ্ভাবিত ও সংগৃহিত হলে আরো কতো ব্যাপকতা মানুষের সামনে উন্মুক্ত হবে তা বলা সম্ভব নয়।

বিশ্ব-জাহান সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয়, আমাদের এ ক্ষুদ্র পৃথিবীটি যেসব উপাদানে গঠিত এ সমগ্র বিশ্ব-জাহান সে একই উপাদানে গঠিত হয়েছে এবং এর মধ্যে আমাদের পৃথিবীর মতো একই নিয়ম সক্রিয় রয়েছে। নয়তো এ পৃথিবীতে বসে আমরা যে অতি দূরবর্তী বিশ্বগুলো পর্যবেক্ষণ করছি, তাদের দূরত্ব পরিমাপ করছি এবং তাদের গতির হিসেব কষছি এসব কোনক্রমেই সম্ভবপর হতো না। এসব কি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, এ সমস্ত বিশ্ব-জাহান একই আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই শাসকের রাজ্য? তারপর যে নিয়ম-শৃংখলা, প্রজ্ঞা-কলাকৌশল, দক্ষতা-শিল্পকারিতা ও সম্পর্ক-সম্বন্ধ এসব লাখো লাখো ছায়াপথ ও তাদের মধ্যে সঞ্চরণশীল শত শত কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে পাওয়া যায় তা দেখে কি

কোন বুদ্ধিমান মানুষ একথা কল্পনা করতে পারে যে, এসব কিছু আপনা-আপনিই হয়ে গেছে? এ নিয়ম-শৃংখলার পেছনে কি কোন ব্যবস্থাপক, এ কলা-কৌশলের পেছনে কোন জ্ঞানী কৌশলী, এ শিল্পকর্মের পেছনে কোন শিল্পী এবং এ সমন্বয় ও সম্পর্কের পেছনে কোন পরিকল্পনাকারী নেই?

৩৮. ভরা নৌযান মানে নূহ আলাইহিস সালামের নৌযান। আর মানব বংশধরদেরকে তাতে আরোহণ করিয়ে দেবার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ নৌযানে বাহ্যত হযরত নূহের কয়েকজন সাথীই বসেছিলেন ঠিকই কিন্তু আসলে তাতে আরোহণ করেছিল কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভকারী সমস্ত মানুষ। কারণ নূহের তুফানে তাদেরকে ছাড়া বাকি সমস্ত মানুষকে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল এবং পরবর্তী মানব বংশধারা এ নৌযান আরোহীদের থেকে শুরু হয়েছিল।

৩৯. এ থেকে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, ইতিহাসে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকাটিই ছিল প্রথম নৌকা। এর পূর্বে নদী ও সাগর পার হবার কোন উপায় মানুষ জানতো না। মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম হযরত নূহকে (আ) এ উপায়টি শেখান। তাঁর তৈরি করা নৌকায় চড়ে যখন আল্লাহর কিছু বান্দা প্লাবন ও জলোচ্ছাসের হাত থেকে রক্ষা পায় তখন পরবর্তীকালে তাদের বংশধররা সামুদ্রিক সফরের জন্য নৌযান তৈরি করতে থাকে।

৪০. আগের নিদর্শনগুলো উল্লেখ করা হয়েছিল তাওহীদের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে, আর এখানে এ নিদর্শনটির উল্লেখ করা হয়েছে এ ধারণা দান করার জন্য যে, প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করার যে ক্ষমতাও মানুষকে দেয়া হয়েছে তা সবই আল্লাহ প্রদত্ত, মানুষ নিজেই সেগুলো অর্জন করেনি। আর এ শক্তিগুলো ব্যবহার করার যে পদ্ধতি সে উদ্ভাবন করেছে তাও আল্লাহর পথনির্দেশনার মাধ্যমেই তার জ্ঞানের আওতাধীন হয়েছে, এগুলো তার নিজের উদ্ভাবন নয়। নিজ শক্তিতে এ বিশাল শক্তিগুলোকে বিজিত করার ক্ষমতা মানুষের ছিল না। প্রকৃতির রহস্য সন্ধান করা এবং তার শক্তিগুলোকে কাজে লাগাবার যোগ্যতাও তার ছিল না, তারপর যে শক্তিগুলোর ওপর আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ আল্লাহ তাদেরকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। অন্যথায় আল্লাহর ইচ্ছা যখন ভিন্নতর হয় তখন যেসব শক্তি মানুষের সেবা করে চলছিল সেগুলো অকস্মাত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মানুষ নিজেকে তাদের সামনে সম্পূর্ণ অসহায় দেখতে পায়। এ সত্যটি সম্পর্কে সজাগ করার জন্য আল্লাহ সামুদ্রিক সফরের ব্যাপারটিকে নিছক নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। আল্লাহ হযরত নূহকে যদি নৌকা তৈরি করার পদ্ধতি না শিখিয়ে দিতেন এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তারা তাতে আরোহণ না করতো তাহলে প্লাবনে সমগ্র মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যেতো। তারপর আল্লাহর কাছ থেকে নৌকা নির্মাণের কায়দা-কানুন শিখে নিয়ে লোকেরা নদী ও সাগর অতিক্রম করার যোগ্যতা অর্জন করে। এর ফলে মানব জাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়। কিন্তু এ প্রথম পর্ব থেকে আজকের বিশাল আকার জাহাজ নির্মাণ পর্যন্ত মানুষ যতদূর উন্নতি সাধন করেছে এবং নৌযান পরিচালনার ক্ষেত্রে

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

এদেরকে যখন বলা হয়, তোমাদের সামনে যে পরিণাম আসছে এবং যা তোমাদের পেছনে অতিক্রান্ত হয়েছে তার হাত থেকে বাঁচো,[৪১] *হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে (তখন এরা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়)। এদের সামনে এদের রবের আয়াতসমূহের মধ্য থেকে যে আয়াতই আসে এরা সেদিকে দৃষ্টি দেয় না।*[৪২] *এবং যখন এদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু আল্লাহর পথে খরচ করো তখন এসব কুফরীতে লিপ্ত লোক মু'মিনদেরকে জবাব দেয়, "আমরা কি তাদেরকে খাওয়াবো, যাদেরকে আল্লাহ চাইলে নিজেই খাওয়াতেন? তোমরা তো পরিষ্কার বিভ্রান্তির শিকার হয়েছো।"*[৪৩]

যতটুকুই নিপুণতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে তা সত্ত্বেও সে এ দাবী করতে পারে না যে, নদী ও সাগর সবই তার নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে এবং তাদের ওপর সে পুরোপুরি বিজয় লাভ করেছে। আজো আল্লাহর পানি আল্লাহরই কুদরতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং যখনই তিনি চান মানুষকে তার জাহাজসহ তার বুকে ডুবিয়ে দেন।

৪১. অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা যা দেখেছে।

৪২. আয়াত বলতে আল্লাহর কিতাবের আয়াতই বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দেয়া হয় আবার এমন নিদর্শনাবলীও বুঝানো হয়েছে যেগুলো প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ও মানুষের নিজের অস্তিত্ব ও তার ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। এসব মানুষকে শিক্ষা দান করে। তবে এ জন্য অবশ্যই মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করার মানসিকতা থাকা জরুরী।

৪৩. এর মাধ্যমে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, কুফরী কেবল তাদের দৃষ্টিশক্তিকেই অন্ধ করে দেয়নি বরং তাদের নৈতিক অনুভূতিকেও নির্জীব করে দিয়েছে। তারা আল্লাহর ব্যাপারেও সঠিক চিন্তা-ভাবনা করে না এবং আল্লাহর সৃষ্টির সাথেও যথার্থ ব্যবহার করে না। তাদের কাছে রয়েছে প্রত্যেক উপদেশের উল্টা জবাব। প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা ও অসদাচরণের জন্য একটি বিপরীত দর্শন। প্রত্যেক সৎকাজ থেকে দূরে থাকার জন্য একটি মনগড়া বাহানা তাদের কাছে তো রয়েছেই।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

এরা[৪৪] বলে, "এ কিয়ামতের হুমকি কবে পুরা হবে? বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"[৪৫] আসলে এরা যে জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছে তা তো একটি বিস্ফোরণের শব্দ, য সহসা এদেরকে ঠিক এমন অবস্থায় ধরে ফেলবে যখন এরা (নিজেদের পার্থিব ব্যাপারে) বিবাদ করতে থাকবে এবং সে সময় এরা কোন অসিয়াতও করতে পারবে না এবং নিজেদের গৃহেও ফিরতে পারবে না।[৪৬]

৪৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে তাওহীদের পরে আর যে বিষয়টি নিয়ে বিরোধ চলছিল সেটি ছিল আখেরাত। এ সম্পর্কিত বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি অবশ্যই সামনের দিকে আলোচনার শেষ পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু যুক্তি উপস্থাপনের পূর্বে এখানে এ বিষয়টির ভিত্তিতে তাদের সামনে আখেরাতের একটি শিক্ষণীয় চিত্র অংকন করা হয়েছে। এর ফলে তারা জানতে পারবে, যে বিষয়টি তারা অস্বীকার করছে তা তাদের অস্বীকার করার ফলে মূলতবী হয়ে যাবে না বরং অনিবার্যভাবে একদিন তাদের এসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হবেই।

৪৫. এ প্রশ্নের অর্থ এ ছিল না যে, যথার্থই তারা কিয়ামতের আসার তারিখ জানতে চায় এবং যদি তাদেরকে জানানো হতো, অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিয়ামত হবে তাহলে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে যেতো এবং তারা তা মেনে নিতো। আসলে এ ধরনের প্রশ্ন তারা করতো নিছক চ্যালেঞ্জের ঢংয়ে কূটতর্ক করার জন্য। এ ব্যাপারে তারা একথা বলতে চাচ্ছিল যে, কোন কিয়ামত টিয়ামত হবে না, তোমরা খামখা আমাদের ভয় দেখাচ্ছো। এ কারণে তাদের জবাবে বলা হয়নি, কিয়ামত অমুক দিন আসবে বরং তাদেরকে বলা হয়েছে, তা আসবে এবং প্রচণ্ড শক্তিতে আসবে।

৪৬. অর্থাৎ কিয়ামত আস্তে আস্তে ধীরে-সুস্থে আসবে এবং লোকেরা তাকে আসতে দেখবে, এমনটি হবে না। বরং তা এমনভাবে আসবে যখন লোকেরা পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে নিজেদের কাজ কারবারে মশগুল থাকবে এবং তাদের মনের ক্ষুদ্রতম কোণেও এ চিন্তা জাগবে না যে, দুনিয়ার শেষ সময় এসে গেছে। এ অবস্থায় অকস্মাত একটি বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে এবং যে যেখানে থাকবে সেখানেই খতম হয়ে যাবে।

হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ও হযরত আবু হুরাইরার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ লোকেরা পথে চলাফেরা করবে, বাজারে কেনাবেচা করতে থাকবে, নিজেদের মজলিসে বসে আলাপ আলোচনা করতে থাকবে, এমন সময় হঠাৎ শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। কেউ কাপড়

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾

৪ রুকূ'

—তারপর একটি শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাজির হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে পড়বে।[৪৭] *ভীত হয়ে বলবে, "আরে, কে আমাদেরকে আমাদের নিঁদমহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো?"*[৪৮]

—"এটা সে জিনিস যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং রসূলদের কথা সত্য ছিল।"[৪৯] *একটিমাত্র প্রচণ্ড আওয়াজ হবে এবং সবকিছু আমার সামনে হাজির করে দেয়া হবে।*

আজ কারো[৫০] *প্রতি তিলমাত্র জুলুম করা হবে না এবং যেমন কাজ তোমরা করে এসেছ ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে—জান্নাতীরা আজ আনন্দে মশগুল রয়েছে।*[৫১]

কিনছিল। হাত থেকে রেখে দেবার সময়টুকু পাবে না, সে শেষ হয়ে যাবে। কেউ নিজের পশুগুলোকে পানি পান করাবার জন্য জলাধার ভর্তি করবে এবং তখনো পানি পান করানো শুরু করবে না তার আগেই কিয়ামত হয়ে যাবে। কেউ খাবার খেতে বসবে এবং এক গ্রাস খাবার মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাবার সুযোগও পাবে না।

৪৭. শিংগা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা, ৭৮ টীকা। শিংগার প্রথম ফুঁৎকার ও দ্বিতীয় ফুঁৎকারের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান হবে, এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন তথ্য নেই। এ সময়টা শত শত ও হাজার হাজার বছর দীর্ঘ হতে পারে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ইসরাফীল শিংগায় মুখ লাগিয়ে আরশের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং কখন ফুঁৎকার দেবার হুকুম হয় তার অপেক্ষা করছেন। শিংগায় তিনবার ফুঁক দেয়া হবে। প্রথমটি হবে نَفْخَةُ الْفَزَع এটি পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত

সৃষ্টিকে হতবিহ্বল করে দেবে। দ্বিতীয়টি হবে نفخة الصعق এটি শোনার সাথে সাথেই সবাই মরে পড়ে যাবে। তারপর যখন একমাত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ থাকবে না তখন পৃথিবীকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দেয়া হবে। উক্কাযের বাজারের সমতল ভূমির মতো তাকে এমনভাবে সমতল করা হবে যে, তার মধ্যে সামান্য একটু ভাঁজও কোথাও পড়ে থাকবে না। তারপর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে একটি বিকট ধমক দেবেন আর তা শুনতেই প্রত্যেক ব্যক্তিই যেখানে সে মরে পড়ে গিয়েছিল সেখানকার পরিবর্তিত জমি থেকেই উঠে দাঁড়াবে। এটিই শেষ ফুঁক বলে পরিচিত। এর নাম হবে نفخة القيام لرب العالمين কুরআন মজীদের বিভিন্ন ইশারা-ইংগিত থেকে এ বিষয়বস্তুটিরই প্রতি সমর্থন পাওয়া গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ৫৬-৫৭ ও সূরা ত্বা-হা, ৮২-৮৩ টীকা।

৪৮. অর্থাৎ তখন তাদের এ অনুভূতিই থাকবে না যে, তারা মরে গিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে এখন আবার তাদেরকে জীবিত করে উঠানো হয়েছে। বরং তারা এ চিন্তায় মগ্ন থাকবে যে, তারা ঘুমিয়েছিল, এখন হঠাৎ কোন ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণে জেগে উঠেছে এবং ছুটে চলছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা ৭৮ এবং ইবরাহীম, ১৮ টীকা)

৪৯. কে এ জবাব দেবে, তা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। হতে পারে কিছুক্ষণ পরে তারা নিজেরাই বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে এবং মনে মনে বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এ তো সে জিনিসই যার খবর আল্লাহর রসূল আমাদের দিতেন এবং আমরা তাঁকে মিথ্যুক বলতাম। আবার এও হতে পারে, মু'মিনরা তাদের বিভ্রান্তি দূর করে দেবে এবং তাদেরকে জানাবে, এটা ঘুম থেকে জেগে ওঠা নয় বরং মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবন। তাছাড়া এও হতে পারে যে, কিয়ামতের সমগ্র পরিবেশ তাদেরকে এ জবাব দেবে অথবা ফেরেশতারা তাদেরকে প্রকৃত অবস্থা জানাবে।

৫০. কাফের, মুশরিক, ফাসেক ও অপরাধীদেরকে যখন আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে তখন আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে এ ভাষণ দেবেন।

৫১. এ বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে হাশরের ময়দানে আটকে রাখা হবে না বরং শুরুতেই তাদেরকে কোন প্রকার হিসেব-নিকেশ ছাড়াই অথবা সামান্য হাল্কা হিসেব গ্রহণ করার পর জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কারণ তাদের রেকর্ড হবে পরিষ্কার। আদালত চলাকালীন সময়ে তাদেরকে অপেক্ষা করার কষ্ট বরদাশ্ত করার কোন প্রয়োজন হবে না। তাই মহান আল্লাহ হাশরের ময়দানে জবাবদিহিকারী অপরাধীদেরকে বলবেন, দেখো, যেসব সৎলোককে তোমরা দুনিয়ায় বোকা মনে করে বিদ্রূপ করতে তারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার কারণে আজ জান্নাতে বসে আরাম করছে এবং তোমরা যারা নিজেদেরকে অতি বুদ্ধিমান ও চালাক-চতুর মনে করতে তারা আজ দেখো কেমন এখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের অপরাধের জন্য জবাবদিহি করছো।

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ
وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ
أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ
أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾

তারা ও তাদের স্ত্রীরা ঘন ছায়ায় রাজকীয় আসনে হেলান দিয়ে বসে আছে। সবরকমের সুস্বাদু পানাহারের জিনিস তাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা কিছু তারা চাইবে তা তাদের জন্য হাজির রয়েছে। দয়াময় রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে "সালাম" বলা হয়েছে——এবং হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও।[৫২] হে আদম সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের এ মর্মে হিদায়াত করিনি যে, শয়তানের বন্দেগী করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমারই বন্দেগী করো, এটিই সরল–সঠিক পথ?[৫৩] কিন্তু এ সত্ত্বেও সে তোমাদের মধ্য থেকে বিপুল সংখ্যককে গোমরাহ করে দিয়েছে, তোমাদের কি বুদ্ধি–জ্ঞান নেই?[৫৪] এটা সে জাহান্নাম, যার ভয় তোমাদের দেখানো হতো। দুনিয়ায় যে কুফরী তোমরা করতে থেকেছো তার ফলস্বরূপ আজ এর ইন্ধন হও।

৫২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, সৎকর্মশীল মু'মিনদের থেকে ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও। কারণ দুনিয়ায় তোমরা তাদের সম্প্রদায়, পরিবার ও গোষ্ঠীর অন্তরভুক্ত থাকলে থাকতে পারো, কিন্তু এখানে এখন তোমাদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে আলাদা হয়ে যাও। এখন তোমাদের কোন দল ও জোট থাকতে পারে না। তোমাদের সমস্ত দল ভেঙে দেয়া হয়েছে। তোমাদের সকল প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়তা খতম করে দেয়া হয়েছে। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখন একাকী ব্যক্তিগতভাবে নিজের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৫৩. এখানে আবার আল্লাহ "ইবাদাত"কে আনুগত্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআনে আমি বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন আল বাকারাহ, ১৭০; আন নিসা, ১৪৫; আল আনআম, ৮৭ ও ১০৭; আত্ তাওবা, ৩১; ইবরাহীম, ৩২;

আল কাহ্‌ফ, ৫০; মারয়াম, ২৭; আল কাসাস, ৮৬ এবং সাবা, ৬৩ টীকা) এ প্রসংগে এ আয়াতটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে কবীরে যে চমৎকার আলোচনা করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ মানে হচ্ছে لا تطيعوه (তার আনুগত্য করো না)। এর সপক্ষে যুক্তি হচ্ছে, তাকে নিছক সিজদা করাই নিষিদ্ধ নয় বরং তার আনুগত্য করা এবং তার হুকুম মেনে চলাও নিষিদ্ধ। কাজেই আনুগত্য হচ্ছে ইবাদাত। এরপর ইমাম সাহেব এ প্রশ্ন করেছেন, যদি ইবাদাতের অর্থ হয় আনুগত্য তাহলে, أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতে আমাদের কি রসূল ও কর্তৃত্বশীলদের ইবাদাত করার হুকুম দেয়া হয়েছে? তারপর এ প্রশ্নের জবাব তিনি এভাবে দিয়েছেন ঃ "তাঁদের আনুগত্য যখন আল্লাহর হুকুমে করা হয় তখন তা আল্লাহরই ইবাদাত এবং তাঁরই আনুগত্য হবে। দেখছেন না, ফেরেশ্‌তারা আল্লাহর হুকুমে আদমকে সিজদা করলো এবং এটি আল্লাহর ছাড়া আর কারো ইবাদাত ছিল না। কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য একমাত্র তখনই তাদের ইবাদাত হতে পারে যখন এমন ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা হবে যে ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করার হুকুম আল্লাহ দেননি।" তারপর বলেন, "তোমার সামনে যদি কোন লোক আসে এবং তোমাকে কোন জিনিসের হুকুম দেয় তাহলে দেখো তার এ হুকুম আল্লাহর হুকুমের অনুসারী কিনা। অনুসারী না হলে শয়তান সে লোকদের সহযোগী হয়েছে। যদি এ অবস্থায় তুমি তার আনুগত্য করো তাহলে তুমি তার ও তার শয়তানের ইবাদাত করলে। অনুরূপভাবে তোমার নিজের প্রবৃত্তি যদি তোমাকে কোন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে তাহলে এ ক্ষেত্রে শরীয়াতের দৃষ্টিতে সে কাজটি করার অনুমতি আছে কিনা দেখো। অনুমতি না থাকলে তোমার প্রবৃত্তি নিজেই শয়তান হয়ে গেছে অথবা শয়তান তার সহযোগী হয়েছে এ অবস্থায়-যদি তুমি তার আনুগত্য করো তাহলে তুমি তার ইবাদাত করলে।" সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি আবার বলেছেন, "কিন্তু শয়তানের ইবাদাত করার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কখনো এমন হয়, মানুষ একটি কাজ করে এবং তার অংগ-প্রত্যংগের সাথে সাথে তার কন্ঠও তার সহযোগী হয় এবং মনও তার সাথে অংশ গ্রহণ করে। আবার কখনো এমনও হয়, অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে মানুষ একটি কাজ করে কিন্তু অন্তর ও কন্ঠ সে কাজে তার সহযোগী হয় না। কেউ কেউ এমন অবস্থায় একটি গোনাহ করে, যখন তার অন্তর তাতে সায় দেয় না এবং তার কন্ঠ সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, এ অবস্থায় সে স্বীকার করে আমি এ খারাপ কাজ করছি। এ হচ্ছে নিছক বাইরের অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে শয়তানের ইবাদাত। আবার এমন কিছু লোকও আছে যারা ঠাণ্ডা মাথায় অপরাধ করে এবং মুখেও নিজেদের এ কাজে আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করে। ....এরা ভিতরে বাইরে উভয় পর্যায়ে শয়তানের ইবাদাতকারী।" (তাফসীরে কবীর, ৭ খণ্ড, ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা)

৫৪. অর্থাৎ যদি তোমরা বুদ্ধি-জ্ঞান বঞ্চিত হতে এবং তারপর নিজেদের রবকে ত্যাগ করে তোমাদের শত্রুদের ইবাদাত করতে তাহলে তোমাদের জন্য কোন ওজরের অবকাশ ছিল না। কিন্তু তোমাদের কাছে তো আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধি-জ্ঞান ছিল। তার মাধ্যমে তোমরা দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কারবার করে চলছিলে এবং আল্লাহ তোমাদের পয়গম্বরদের মাধ্যমে সতর্কও করে দিয়েছিলেন। এরপরও যখন তোমরা তোমাদের শত্রুদের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হয়েছো এবং তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে তখন নিজেদের বোকামির দায়-দায়িত্ব থেকে তোমরা কোনক্রমেই মুক্ত হতে পারো না।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاۤءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاۤءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ দেবে এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করে এসেছে।[৫৫]

আমি চাইলে এদের চোখ বন্ধ করে দিতাম, তখন এরা পথের দিকে চেয়ে দেখতো, কোথা থেকে এরা পথের দেখা পাবে? আমি চাইলে এদের নিজেদের জায়গায়ই এদেরকে এমনভাবে বিকৃত করে রেখে দিতাম যার ফলে এরা না সামনে এগিয়ে যেতে পারতো, না পেছনে ফিরে আসতে পারতো।[৫৬]

৫৫. যে উদ্ধত অপরাধীরা তাদের অপরাধ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলবে এবং আমলনামার নির্ভুলতাও মেনে নেবে না, তাদের ব্যাপারে এ ফায়সালা দেয়া হবে। তখন আল্লাহ হুকুম দেবেন, ঠিক আছে, তোমাদের বাজে কথা বন্ধ করো এবং এখন দেখো তোমাদের নিজেদের শরীরের অংগ-প্রত্যংগ তোমাদের কৃতকর্মের কি বর্ণনা দেয়। এ প্রসংগে এখানে কেবলমাত্র হাত ও পায়ের সাক্ষদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে, তাদের চোখ, কান, জিহ্বা এবং শরীরের চর্মও তাদেরকে দিয়ে যেসব কাজ করানো হয়েছে সেগুলোর পূর্ণ বিবরণ শুনিয়ে দেবে ঃ

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (النور : ٢٤)

حَتّٰٓى اِذَا مَا جَاۤءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (حم السجده : ٢٠)

এখানে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একদিকে আল্লাহ বলেন, আমি এদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবো এবং অন্যদিকে সূরা নূরের আয়াতে বলেন, এদের কণ্ঠ সাক্ষ দেবে— এ দু'টি বক্তব্যের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে, কণ্ঠ রুদ্ধ করার অর্থ হলো, তাদের কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া। অর্থাৎ এরপর তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মর্জি মাফিক কথা বলতে পারবে না। আর কণ্ঠের সাক্ষদানের অর্থ হচ্ছে, পাপিষ্ঠ লোকেরা

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝٦٨ وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۝٦٩ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝٧٠

৫ রুকূ'

যে ব্যক্তিকে আমি দীর্ঘ আয়ু দান করি তার আকৃতিকে আমি একেবারেই বদলে দেই[৫৭] (এ অবস্থা দেখে কি) তাদের বোধোদয় হয় না?

আমি এ (নবী)–কে কবিতা শিখাইনি এবং কাব্য চর্চা তার জন্য শোভনীয়ও নয়।[৫৮] এ তো একটি উপদেশ এবং পরিষ্কার পঠনযোগ্য কিতাব, যাতে সে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে[৫৯] এবং অস্বীকারকারীদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

তাদেরকে কোন্ কোন্ কাজে লাগিয়েছিল, তাদের মাধ্যমে কেমন সব কুফরী কথা বলেছিল, কোন্ ধরনের মিথ্যা উচ্চারণ করেছিল, কতপ্রকার ফিত্না সৃষ্টি করেছিল এবং কোন্ কোন্ সময় তাদের মাধ্যমে কোন্ কোন্ কথা বলেছিল সেসব বিবরণ তাদের কন্ঠ স্বতস্ফূর্তভাবে দিয়ে যেতে থাকবে।

৫৬. কিয়ামতের চিত্র অংকন করার পর এখন এদেরকে জানানো হচ্ছে, এ কিয়ামত তো তোমাদের কাছে দূরের জিনিস বলে মনে হচ্ছে কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো, এ দুনিয়ায় যে জীবনের জন্য তোমরা অহংকারে স্ফীত হচ্ছো, তোমরা কিভাবে আল্লাহর বিপুল শক্তির হাতে অসহায় হয়ে আছো! যে চোখের দৃষ্টিশক্তির কারণে তোমরা দুনিয়ার সমস্ত কাজ করে যাচ্ছো আল্লাহর একটিমাত্র ইশারায় তা অন্ধ হয়ে যেতে পারে। যে পায়ের ওপর ভর করে তোমরা এসব দৌড়াদৌড়ি ও চেষ্টা–তদবীর চালাচ্ছো, আল্লাহর একটিমাত্র হুকুমে অকস্মাত তা অবশ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর দেয়া এ শক্তিগুলো যতক্ষণ কাজ করতে থাকে ততক্ষণ তোমরা আত্মশক্তির বিভ্রমে মশগুল হয়ে থাকো। কিন্তু যখন এদের মধ্য থেকে কোন একটি শক্তিও বিকল হয়ে পড়ে, তখন তোমাদের শক্তির বহর বুঝতে আর তোমাদের মোটেই বেগ পেতে হয় না।

৫৭. আকৃতি বদলে দেয়ার মানে হচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ মানুষের অবস্থা শিশুদের মতো করে দেন। ঠিক শিশুদের মতোই তারা চলতে ফিরতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অন্যেরা তাদেরকে উঠাতে বসাতে ও সহায়তা দিয়ে চলাফেরা করাতে থাকে। অন্যেরা তাদেরকে পানাহার করায়। তারা নিজেদের কাপড়ে ও বিছানায় পেশাব পায়খানা করে দেয়। বালসুলভ কথা বলতে থাকে, যা শুনে লোকেরা হেসে ওঠে। মোট কথা যে ধরনের দুর্বলতার মধ্য দিয়ে তারা দুনিয়ার জীবন শুরু করেছিল, জীবন সায়াহ্নে প্রায় সেই একই অবস্থায় পৌঁছে যায়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَٰلِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

এরা কি দেখে না, আমি নিজের হাতে তৈরি জিনিসের[৬০] মধ্য থেকে এদের জন্য সৃষ্টি করেছি গবাদি পশু এবং এখন এরা তার মালিক। আমি এভাবে তাদেরকে এদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছি যে, তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর এরা সওয়ার হয়, কারো গোশত খায় এবং তাদের মধ্যে এদের জন্য রয়েছে নানা ধরনের উপকারিতা ও পানীয়। এরপর কি এরা কৃতজ্ঞ হয় না?[৬১] এ সবকিছু সত্ত্বেও এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে এবং এদেরকে সাহায্য করা হবে এ আশা করছে। তারা এদের কোন সাহায্য করতে পারে না বরং উল্টো এরা তাদের জন্য সদা প্রস্তুত সৈন্য হয়ে বিরাজ করছে।[৬২] হ্যাঁ, এদের তৈরি কথা যেন তোমাকে মর্মাহত না করে এদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কথাই আমি জানি।[৬৩]

৫৮. কাফেররা তাওহীদ, আখেরাত, মৃত্যুপরের জীবন ও জান্নাত–জাহান্নাম সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে নিছক কাব্য কথা গণ্য করে নিজেরা তাকে গুরুত্বহীন করে দেবার যে প্রচেষ্টা চালাতো এখানে তারই জবাব দেয়া হয়েছে।

৫৯. জীবন বলতে চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ বুঝানো হয়েছে। যার অবস্থা পাথরের মতো নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় নয়। আপনি তার সামনে যতই যুক্তি সহকারে হক ও বাতিলের পার্থক্য বর্ণনা করেন না কেন এবং যতই সহানুভূতি সহকারে তাকে উপদেশ দেন না কেন সে কিছুই শোনে না, বোঝে না এবং নিজের জায়গা থেকে একটুও নড়ে না।

৬০. হাত শব্দটি আল্লাহর জন্যে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ পবিত্র ও মহান আল্লাহ শরীর ও দেহাবয়বের অধিকারী এবং মানুষের মতো হাত দিয়ে কাজ করেন। বরং এর মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, এ জিনিসগুলো আল্লাহ নিজেই তৈরি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিকর্মে অন্য কারো সামান্যতমও অংশ নেই।

৬১. নিয়ামতকে নিয়ামতদাতা ছাড়া অন্য কারো দান মনে করা, এ জন্য অন্য কারো অনুগ্রহভাজন হওয়া এবং নিয়ামতদাতা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে নিয়ামতলাভের আশা করা অথবা নিয়ামত চাওয়া, এ সবকিছুই নিয়ামত অস্বীকারেরই নামান্তর। অনুরূপভাবে নিয়ামতদাতার প্রদত্ত নিয়ামতকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করলেও নিয়ামত অস্বীকার করাই হয়। কাজেই একজন মুশরিক ও কাফের এবং মুনাফিক ও ফাসেক নিছক মুখে ধন্যবাদ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা গণ্য হতে পারে না। এ জন্তু-জানোয়ারগুলোকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, একথা মেনে নিতে মক্কার কাফেররা অস্বীকার করতো না। তাদের একজনও এগুলোর সৃষ্টির ব্যাপারে অন্য উপাস্যদের হাত আছে বলে দাবী করতো না। কিন্তু এ সবকিছু মেনে নেবার পরও যখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের জন্য নিজেদের উপাস্য দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, তাদের সামনে নজরানা পেশ করতো এবং আরো নিয়ামত দান করার জন্য তাদের কাছে প্রার্থনা করতো, এ সংগে তাদের জন্য বলিদান করতে থাকতো, তখন আল্লাহর কাছে তাদের মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়তো। এ জন্যই আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামত অস্বীকারকারী ও অকৃতজ্ঞ বলে অভিহিত করছেন।

৬২. অর্থাৎ ঐ মিথ্যা উপাস্য দেবতারা নিজেরাই তাদের অস্তিত্ব, টিকে থাকা, সংরক্ষণ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য এসব পূজা উপাসনাকারীর মুখাপেক্ষী। এ সেনাবাহিনী ছাড়া তাদের খোদায়ী এক দিনও চলে না। এরা তাদের সার্বক্ষণিক উপস্থিত দাস। এরা তাদের দরবার বানিয়ে ও সাজিয়ে রাখছে। এরা তাদের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের ভক্তে-অনুরক্তে পরিণত করছে। তাদের সমর্থনে এরা ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করছে। তারপরই তাদের খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। নয়তো কেউ তাদের কথা জিজ্ঞেসও করতো না। তারা আসল খোদা নয়। কেউ তাদেরকে মেনে নিক বা না মেনে নিক তারা নিজ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সমগ্র বিশ্ব-জাহানে কর্তৃত্ব চালিয়ে যাবে, এমন ক্ষমতা তাদের নেই।

৬৩. সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। গোপন ও প্রকাশ্য কথা বলে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, মক্কার কাফেরদের বড় বড় সরদাররা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যার ঝড় সৃষ্টি করছিল। তারা ভালোভাবেই জানতো এবং নিজেদের ব্যক্তিগত মজলিসে একথা স্বীকার করতো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তারা যেসব অপবাদ দিচ্ছে সেগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন। তারা লোকদের মনে তাঁর বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে কবি, গণক, যাদুকর, পাগল এবং আরো নাজানি কত কি বলতো। কিন্তু তাদের নিজেদের বিবেক একথা মানতো এবং তারা পরস্পরের সামনে স্বীকারও করতো যে, এসব ডাহা মিথ্যা কথা এবং নিছক তাঁর দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তারা এগুলো তৈরি করছে। তাই আল্লাহ তাঁর নবীকে বলছেন, এদের বাজে কথায় মন খারাপ করো না। যারা মিথ্যা দিয়ে সত্যের মোকাবিলা করে তারা শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়ায়ও ব্যর্থ হবে এবং আখেরাতেও নিজেদের অশুভ পরিণতি দেখে নেবে।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَٰمَ وَهِيَ
رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ
تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ
أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّٰقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ
إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَٰنَ الَّذِى
بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

মানুষ[৬৪] কি দেখে না, তাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে এবং তারপর সে দাঁড়িয়ে গেছে স্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে?[৬৫] এখন সে আমার ওপর উপমা প্রয়োগ করে[৬৬] এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়[৬৭] বলে, "এ হাড়গুলো যখন পচে গলে গেছে এতে আবার প্রাণ সঞ্চার করবে কে?" তাকে বলো, এদেরকে তিনি জীবিত করবেন যিনি প্রথমে এদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজ জানেন। তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে নিজেদের চুলা জ্বালিয়ে থাকো।[৬৮] যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়, যখন তিনি পারদর্শী স্রষ্টা। তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তাঁর কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে হুকুম দেন, হয়ে যাও এবং তা হয়ে যায়। পবিত্র তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

৬৪. এবার কাফেরদের প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক জবাব দেয়া হচ্ছে। ৪৮ আয়াতে এ প্রশ্নটি উদ্ধৃত হয়েছে। "কিয়ামতের হুমকি কবে পূর্ণ হবে" তাদের এ প্রশ্ন এ জন্য ছিল না যে, তারা কিয়ামত আসার তারিখ জানতে চাচ্ছিল বরং এ জন্য ছিল যে, মৃত্যুর পর তারা মানুষদের পুনরবার উঠানোকে অসম্ভব বরং বুদ্ধি বিরোধী মনে করতো। তাই তাদের প্রশ্নের জবাবে আখেরাতের সম্ভাবনার পক্ষে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে।

ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ ও সাঈদ ইবনে জুবাইর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, এ সময় মক্কার কাফের সরদারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি কবরস্তান থেকে কোন. লাশের একটি গলিত হাড় নিয়ে আসে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সেটি ভেঙে ফেলে এবং তার বিচূর্ণিত অংশগুলো বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে বলে, "হে মুহাম্মাদ, তুমি বলছো মৃতদেরকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে। বলো, এ পচা-গলা হাড়গুলোকে আবার কে জীবিত করবে?" সংগে-সংগেই এ আয়াতগুলোতে এর জবাব দেয়া হয়।

৬৫. অর্থাৎ এমন শুক্রবিন্দু যার মধ্যে নিছক একটি প্রাথমিক জীবন-কীট ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তাকে উন্নতি দান করে আমি এমন পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছি যার ফলে সে কেবল প্রাণীদের মতো চলাফেরা ও পানাহার করতে থাকেনি বরং এর থেকে অগ্রসর হয়ে তার মধ্যে চেতনা, বুদ্ধি-জ্ঞান এবং তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা, যুক্তি প্রদর্শন করা ও বাগ্মীতার এমন সব যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে যা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। এমন কি এখন সে নিজের স্রষ্টাকেও বিদ্রূপ করতে এগিয়ে আসছে।

৬৬. অর্থাৎ আমাকে সৃষ্টিকুলের মতো অক্ষম মনে করে এবং এ ধারণা পোষণ করে যে, মানুষ যেমন কোন মৃতকে জীবিত করতে পারে না ঠিক তেমনি আমিও পারি না।

৬৭. অর্থাৎ একথা ভুলে যায় যে, আমি নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে এমন প্রাথমিক জীবন-কীট সৃষ্টি করেছি, যা তার সৃষ্টির উৎসে পরিণত হয়েছে এবং তারপর এ কীটকে লালন করে তাকে এত বড় করে দিয়েছি, যার ফলে সে আজ আমার সামনে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

৬৮. এর অর্থ হচ্ছে, তিনি সবুজ বৃক্ষসমূহে এমন দাহ্যবস্তু রেখে দিয়েছেন যা ব্যবহার করে তোমরা কাঠের সাহায্যে আগুন জ্বালিয়ে থাকো। অথবা এর মাধ্যমে 'মারখ' ও 'আফার' নামক দু'টি গাছের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ গাছ দু'টির কাঁচা ডাল নিয়ে আরবের লোকেরা একটার ওপর আর একটাকে মারতো, ফলে তা থেকে আগুন ঝরে পড়তো। প্রাচীন যুগে গ্রামীণ আরবরা আগুন জ্বালাবার জন্য চকমকি হিসেবে এ ডাল ব্যবহার করতো এবং সম্ভবত আজো করে থাকে।